পাতার ক্যামেরা

পাতার ক্যামেরা

লুবনা চর্যা

কবিতাক্রম

চান্দের গাড়ির ড্রাইভার ৯ ট্রমা ১০
এক পৃষ্ঠা শূন্যতা অথবা চাঁদের হাসিমুখ ১১
দুইজন বৃদ্ধা পাশাপাশি শুয়ে আছে ১২ আমাদের আড্ডা হোক অতিসত্বর ১৩
ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা পায়ে ১৪ পরিবর্তনের হাওয়া – আমাদের অস্বস্তি, স্বস্তি ১৫
পৃথিবীতে ভালোবাসার বয়স ১৬ আলস্য দিনে যা যা হয় ১৭
আমরা যে নিতান্তই মুখ্যুসুখ্যু ঘাস ১৮ ওরা বিচার করে প্রাচীন পুস্তক খুলে ১৯
মিডিয়া ২১ মুরগি ঘরে গেছে, মোরগ বসে আছে ২২
যে গাছ ব্যথার স্বাদ ভুলে গেছে ২৩
লোকটা বাংলাদেশেরই একটা লোক ছিল ২৪
আমি এখনো জন্মাইনি ২৫ হঠাৎ একটা ছোট্ট ঘুম ২৭
মানব প্রজাতির অকালপ্রয়াণ ২৮ বহুদিন ৩০
বহু আলোকবর্ষ আগের ভবিষ্যতে সমুদ্রতীরে ৩১ রিঅ্যাকটিভ ৩৪
রাগ ৩৫ আজ আমার ভালোবাসতে ইচ্ছা করে ৩৬
রূপান্তর ৩৭ অ্যান্টিবায়োটিক ৩৯ সূর্যের প্রখর আলোতে ৪০
যুদ্ধ ফুরায় না ৪১ পাথর ও পাথরের নৌকা ৪২
চলো হায়েনা হয়ে যাই ৪৩ পিয়োর সুইসাইডাল মোমেন্ট ৪৫
আধুনিক নাগরিক হতে গিয়ে হারিয়ে গেছে তোমার পৃথিবী ৪৭
সাঁকো ৪৯ আমি সেই রোদকেই ভালোবাসি ৫০
একটি ভারাক্রান্ত দিন শেষে ৫২ আমাদের জাহাজ ভ্রমণ ৫৩
এখন কান্দো ক্যান ৫৪ সিনেমা ৫৫ আইসক্রিম ৫৬
ভালোবাসা হাত ছেড়ে দিলে ৫৭ নৈঃশব্দ্যের মৃত্যুদণ্ড ৫৮
এক জন্মান্ধ কঙ্কাল ৬০ পাগলাগারদ ৬১ বৈপরীত্যের প্রিয় আহার ৬৩
ক্রসফায়ার, শাট শাট ৬৪ বাজাও আনন্দের সুর ৬৫ ধারণা ৬৬
মরণে-জাগরণে ৬৭ টাকা, তোমার অভাবে ৬৯
সময়ের সাথে প্রেম ৭০ মা ও ছানা ৭১ তুমি অ্যাবসেন্ট, তুমি মুক্ত ৭২
ব্যক্তিগত ঈশ্বর ৭৩ ফানি লাভ স্টোরি ৭৪ আগামীকাল ৭৬
ছায়ারা জড়ো হয় বৃক্ষের গানে ৭৭
এখানে জীবন নাই, এখানে বিস্ময় নাই ৭৮

চান্দের গাড়ির ড্রাইভার

আমি প্রায় ভালো থাকি,
মানে ভালো থাকার একটু নিচে থাকি।
আর আঙুর ফলকে টক ঘোষণা করা সেই
শিয়ালের মতো ভাবি, সমুদ্রের তলদেশে
একটু নিচে থাকাই উত্তম। তাহলে
ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারবে না মাছরাঙা কিংবা ঈগল।
আমি প্রায় ভালো থাকি,
মানে ভালো থাকার একটু নিচে থাকি।
হয়তো আমার জীবনযাপনে মশলা কম।
তবু তা স্বাস্থ্যসম্মত, দূরে থাকবে যম।
জোয়ান বায়েজের মতো চুরাশি বছরেও
গেয়ে উঠতে চাই প্রেমের গান। মাটিতে শিকড়
পেতে আকাশে চাষ করি ডানার বাগান।
আমি প্রায় ভালো থাকি,
মানে ভালো থাকার একটু নিচে থাকি
কিন্তু উপরে থাকি খারাপ থাকার।
দুইদিকের অতি উচ্ছ্বাসের মাঝখানে এক
শান্তশিষ্ট পাহাড়ি পথ। দুইপাশের চড়াই-উতরাই
সাবধানে এড়িয়ে নিয়ে যাই গাড়ি,
আমি এক চান্দের গাড়ির ড্রাইভার।

ট্রমা

কোনো একদিন নিশ্চয়ই মরে যাব আর
হয়তো শিগগিরই নিহত হব – এই দুইটা বাক্যের
মধ্যখানে এসে বসে থাকে ট্রমা।
নিজের কী অপরাধ জানি না
ভেড়ার পালের স্তবক মানি না –
একটা পাথরখণ্ডের উপর রক্তের দাগ
অগুনতি সমুদ্র মিলে তবু ধুয়ে দিতে পারে না –
সমুদ্রে গোসল করতে নেমে হারানো কানের দুলের মতো
তারা হারিয়ে ফেলেছিল তাদের চোখ।
সেই থেকে ভালোবাসার নাম হলো দুর্ভোগ।
বৃষ্টির পানি বৃক্ষ জন্মানোর সহায়ক।
মানুষ যদি না বাঁচে তবে সৃষ্টিশীলতাও বন্ধ হোক।

এক পৃষ্ঠা শূন্যতা বা চাঁদের হাসিমুখ

শূন্যতা দেখতে ঠিক কীরকম ভাবতে ভাবতে
আমি পূর্ণতাকে ভেবে ফেলি। পুকুরের পানিতে
বৃষ্টির কণা ঝরে ঝরে ছোটো থেকে বড়ো শূন্য
তৈরি করতে করতে মিলিয়ে যায়। ফলত এসব
জলজ শূন্য পুকুর, খাল-বিল, নদীতে পানি
বাড়িয়ে দেয়। শূন্যতা কেমন হতে পারে ভাবতে ভাবতে
নীলাকাশে তাকাই। কিন্তু সেখানেও শূন্যতা দেখি না –
দেখি মেঘেদের মায়াবতী গ্রাম, পাখিদের কোলাহল।
শূন্যতার কথা ভাবতে ভাবতে সিলিং-এর দিকে তাকাই।
দেখি এক কিশোর কবিবন্ধুর মুখ, যে শালিকের ভাষা
বুঝতে পারত। তার গলায় টাইয়ের মতো ঝুলছিল
যে শূন্যতা, সেখানে আমি আসলে মৃতদেহ না –
একটা শালিককে দোল খেতে দেখছিলাম।
'এক শালিকে যাত্রা নাস্তি, দুই শালিকে সুখ'
কে যেন দূর থেকে সুর করে এই ছড়া পড়ছিল।
শূন্যতা আঁকব বলে আমি সাদা পৃষ্ঠার দিকে তাকাই
কিন্তু সাদা পৃষ্ঠাও তো শূন্য না। যে শূন্য সাদা কাগজ
আমি কিনে রেখে দিই ছবি আঁকব বলে, সবগুলোই
ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে যায় আঁকিবুকিতে। তাই মনে হয়
শূন্যতা আপেক্ষিক, পূর্ণতাই দীর্ঘমাত্রিক। এমনকি
তোমার অনুপস্থিতি যে শূন্যতা সৃষ্টি করে রাখে সারাক্ষণ
তারাও পূর্ণ হয়ে থাকে তোমাকে চাওয়ার তৃষ্ণায়।

এক পক্ষ ধরে একটু একটু করে চাঁদ বড়ো হতে হতে
যখনই শূন্যতার বৃত্ত পূর্ণ করে, তোমরা তাকে পূর্ণতা
বা পূর্ণিমা বলে ডাকো। কই, শূন্যতা তো ডাকো না!

দুইজন বৃদ্ধা পাশাপাশি শুয়ে আছে

দুইজন বৃদ্ধা পাশাপাশি শুয়ে আছে। তাদের একজনের
জরায়ু থেকে অন্যজনের জন্ম। কিন্তু এখন তারা পাশাপাশি শুয়ে আছে
যমজ বোনের মতো জড়োসড়ো হয়ে। বিধবা, রংহীন কাপড়ে
নিজেদেরকে জড়িয়ে। এখন তারা অনেক কথাই বলতে পারে,
যা একদিন সংকোচের শামুক হয়ে মুখের মধ্যে জিভের মতো বাস করত।
এখন তাদের সারা গায়ে ব্যথা, হৃদয়ে তবু সোনালু সকালের কথা।
চুল বিনুনি করতে করতে সেসব তারা বলে চলে।
একজন আরেকজনের জরায়ু থেকে জন্ম নিলেও এখন তারা
এক নদী থেকে জন্ম নেয়া অপর নদীর মতো পাশাপাশি বয়ে চলে।

আমাদের আড্ডা হোক অতিসত্বর

আমার ফুসফুসের সাথে আমার কখনো দেখা হয় নাই।
আমার ধমনীর সাথে আমি কখনো কথা বলি নাই।
আমার অন্ত্র, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী!
বহুদিন একসাথে থেকেও অপরিচিতের মতন
মারা যাব আমরা। অথচ কোথাও নীল পদ্মবনে ফুটেছিল
সাদা এক টুকরো মেঘ, সহস্র সমুদ্রচারীর সমুদ্রগমন শেষে
কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল অতৃপ্ত সাগর। পার্কের ঘাসের ময়দানে
হয়তো কোনো এক স্বপ্নে দেখা হতে পারত আমার সাথে আমার হৃদয়ের।
দুজনে মিলে একটা বিড়ি ফুঁকতাম, একটা আইসক্রিম খেতাম ভাগ করে।
কিন্তু আমার সাথে আমার পাঁজরের হাড়ের কোনো মত বিনিময় হয় নাই।
আমার সাথে আমার স্তনের কখনো খুনসুটি হয় নাই।
প্রকাণ্ড চাঁদ উঠলে ঝোপঝাড়ের উপরে, তখনও সন্ধি হয় নাই
আমার সাথে আমার বেয়াড়া মগজের। অচেনা পড়শির মতো
আমরা থেকে যাব একই পাড়ায়, তবু কথা বলব না
আত্মগরিমায়। ধ্যানভঙ্গ মুনির মতো প্রার্থনা করব
একমুঠো অকালবৃষ্টির, যাতে আমার সাথে আমার ইন্দ্রিয়গুলোর
সেদিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আড্ডা হয় নিখোঁজ কোনো বকুলতলায়।

ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা পায়ে

পার হয়ে যায় আরো একটা দিন ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা পায়ে,
যেন এক নির্জন শতাব্দী। মোবাইলের স্ক্রিনে খেয়াল করে
না তাকালে হয়তো জানাই হতো না দিনটার নাম কী,
তারিখ কত। টাইম ল্যাপস ভিডিয়োতে মেঘেদের
দূরে সরে যাওয়ার মতো চলে যায় একেকটা দিন
আর আমি বহুগামীর মতো তাদের সবারই প্রেমে পড়ে যাই।
একটা দিনকে মিস করতে করতে আরো একটা
নতুন দিনকে মিস করার সময় চলে আসে।
এভাবেই চলছে আমার দিনকাল।
তোমার কী খবর মহাকাল?
তুমিও কি অনেকদিন ধরে আসব আসব করতে করতে
আসার আগেই হারিয়ে যাবা? আর আমি কি অন্যকে
হারানোর ব্যথা ভুলতে ভুলতে তোমাকেও হারানোর ব্যথার
মহাশূন্য নীলে ঢুকে পড়ব একটা সবুজ টিয়া হয়ে?

পরিবর্তনের হাওয়া – আমাদের অস্বস্তি, স্বস্তি

পরিবর্তনের হাওয়া লাগে
মাঠে শুকাতে দেয়া গুচ্ছ গুচ্ছ রঙিন কাপড়ে।
আকাশ ছেয়ে আসে
মস্ত হাইড্রার মতো মেঘে।
পরিবর্তনের হাওয়া উড়িয়ে নেয়
সভ্য বস্ত্র, পার্লারের পর্দা,
মৈত্রী সম্মেলনের পতাকা।
পরিবর্তনের হাওয়াতে নাচ করে
টিয়ার পালক গায়ে জড়ানো খেতের নতুন চারা।
সে হাওয়ায় গ্যাসবেলুনের মতো
উড়ে যায় আমার একমাত্র জামা।
অন্য একটা জামা ধরার প্রচেষ্টা চালাতেই
লোকে বলে, এটা জামাবাজি বা অস্থিরতা।
কিন্তু এহেন জামাবাজি করেও সফল হয় না মিশন,
কারণ কোনো জামা আমার গায়ে লাগে না।
তাহলে কি বাকি জীবন আমাকে
আদুল গায়ে ঘুরে বেড়াতে হবে?
আমার নাজেহাল অবস্থা দেখে
কানা ঈশ্বর মুচকি হাসে।
সে তখন শিশুদের রক্তে অ্যাকোয়ারিয়াম ভরে
তাতে ছেড়ে দিচ্ছিল
নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল কিছু মাছ।
আর তার বধির পরিচারিকারা আইপডে শুনছিল
মানুষের এয়ারটাইট আর্তনাদের অর্কেস্ট্রা।

কানা ঈশ্বর আমার মতো আরো অনেকের
জামা লুকিয়ে রেখেছে
তার প্যারালাইসিসগ্রস্ত দর্জির হেফাজতে।

পৃথিবীতে ভালোবাসার বয়স

বয়সের কথা ভুলে যাও, বরং তুমি ভাবতে পারো
পৃথিবীতে ভালোবাসার বয়স হলো ঠিক কত বছর?
কবে তার জন্মদিন – উইশ করবে বলে সারাবছর
তক্কে তক্কে থেকে জন্মদিনটা যখন আসলো
ঠিক তখনই ভুলে গেলে তুমি। মনে পড়ে এমনই ছিল
সেই অভিমানী, বারবার তুমি যার জন্মদিন ভুলে যেতে
আর সে অভিমানে কখনোই তোমাকে মনে করিয়ে দিত না
সে কথা। সে কথা আজ থাক। তোমার অস্তিত্বের নাম
যদি হয় ভালোবাসা, তাহলে আমি তোমার বয়স খুঁজব না,
খুঁজব ভালোবাসার বয়স। নদীর পাড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে
উড়ে যায় যে নীল বাতাস, আমি তার বয়স জানতে
চেয়েছি কখনো? কিংবা যে মুক্তা লুকিয়ে থাকে
ঝিনুকের মাংসল দেহে – তার বয়স জানার কখনো
হয়নি প্রয়োজন। যে প্রজাপতিরা হেমন্তের বাগানে
খেলা করে ঝরে পড়া পাতাদেরকে কোলে নিয়ে
তুমি তো ছিলে চিরকাল তাদের ডানার রঙেই তুষ্ট।
তাহলে এই সমুদ্রের অতলে বসে বসে ভালোবাসার
গভীরতা না মেপে, মাপছ কেন উটকো বয়স?
ভ্যান গগের ছবিগুলোর অনেক বয়স – তবু তারা প্রতিরাতে
এখনো আকাশ ভর্তি করে তারাদের পিদিম জ্বালিয়ে রাখে।

আলস্য দিনে যা যা হয়

কিছু কিছু দিন আলস্যের সাইনবোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
অবসরের পাখি এসে বসে তার মাথায়। তখন একপাল
একাকিত্বের ভেড়া ঢুকে পড়তে চায় আমার
সূর্যকরোজ্জ্বল সরিষাখেতে আর ঘুড়ির লাটাই দিয়ে
নামিয়ে আনে মেঘ রোদ্দুরের ফলা সরিয়ে। আমি ভেড়াগুলোকে
লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে আসি বহুদূর তেপান্তরে।
যাতে তারা আমার স্বপ্ন, সাহস আর আনন্দের গাছগুলোকে
খেয়ে ফেলতে না পারে। কিন্তু ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে
ফিরে আসতেই দেখি ভেড়াগুলো এবার ফিরে এসেছে
লেফট রাইট করতে করতে সাজপোশাক পরা আর্মি হয়ে।
আলস্যের দিনের বারোটা বাজিয়ে পৃথিবী নামের
আমার শিশু কন্যা কেঁদে ওঠে তীব্র শব্দ করে।
তাকে কোলে নিয়ে ছাদে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি,
পৃথিবী তো কাঁদতেই থাকবে, কখনো আবার হাসবে –
এর মধ্যেই আমাকে টিকে থাকতে হবে, যেভাবে
মাটির গভীরে স্ট্র দিয়ে গাছ শুষে নেয় জীবনের মিষ্টি রস।

আমরা যে নিতান্তই মুখ্যুসুখ্যু ঘাস

হীরার কণা বসানো ছোটো ছোটো চোখে এদিক-ওদিক
তাকিয়ে দেখা কাঠবিড়ালীটাকে মেরে ফেলে
তার লোম দিয়ে তুলি বানিয়ে আঁকছ ছানাপোনা-সহ
সেই মৃত কাঠবিড়ালীর হাসিখুশি ছবি।
গাছ কেটে সেই গাছেরই কাঠ দিয়ে ফ্রেম বানিয়ে
বাঁধিয়ে রাখছ ক্যানভাসে আঁকা গভীর বনানী।
উত্তাল নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীটাকে মেরে ফেলে
আদর করে বাচ্চার নাম রাখছ ‘নদী’।
যুদ্ধের অস্ত্র বেচে ব্যবসা করে সেই টাকায়
যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশেই পাঠাচ্ছ ত্রাণ।
প্রতারণা করে কারো সাথে
আবার তাকে নিয়েই লিখছ বিরহের গান।
সভ্যতা কী জিনিস আমি আজও বুঝতে পারি না।
হয়তোবা তা এতই উচ্চমার্গীয় ব্যাপার
যা ঝড়ের মতো অনেক ওপর থেকে বয়ে যায়।
বড়ো গাছ টের পায়; কিন্তু
আমরা যে নিতান্তই মুখ্যুসুখ্যু ঘাস!

ওরা বিচার করে প্রাচীন পুস্তক খুলে

ওরা বিচার করে প্রাচীন পুস্তক খুলে। সিন্দুকে এই
পুস্তক প্রণেতার ঘন অন্ধকারের মতো কঙ্কালের পাশে
রাখা আছে জীর্ণশীর্ণ পুস্তক। এদিকে সকালবেলা
রোদ উঠে সূর্যমুখীর ডগার মতো হাত ধরে টানে,
'আয় তবে সহচরী' – কিন্তু না, তারা সকাল শুরু করবে
পুস্তকে কী লেখা আছে সেটা জেনে। যখন প্রেমের মৌসুম
আসে, তখনো তারা পুস্তক খুলে দেখে কী লেখা আছে ভেতরে।
লেখা আছে: প্রেম নিষিদ্ধ, তবে সন্তান উৎপাদন করা যেতে পারে।
তারা তাই জ্যান্ত রোবটের মতো সন্তান জন্ম দেয় আর
বাগানের ফুলগাছ উপড়ে ফেলে লাগায় সারি সারি
মারণাস্ত্র গাছ। সন্ধ্যার আসরে শরাবের নামে পান করে
মানব রক্ত, কেননা সেটাই নাকি সবচেয়ে উত্তেজক পানীয়।
খাবার খাওয়ার আগে, বাচ্চার হাগুমুতু সাফ করতে গিয়ে,
কীভাবে কথা বলতে হবে, কীভাবে হাসতে হবে, কাঁদতে হবে,
এমনকি কীভাবে পৃথিবীতে চোখ মেলে তাকাতে হবে –
সবকিছুর উত্তর খোঁজে তারা সেই প্রাচীন গ্রন্থে।
আর যখন কোনো উত্তর খুঁজে না পাওয়া যায়, তখন তারা
মাথা নেড়ে নেড়ে চলে যায় তাদের নেতার কাছে। যার
মস্তিষ্কের কোষগুলো বয়সের ভারে গলে গলে পড়ে গেছে,
যার হৃৎপিণ্ড সেই কোন কৈশোরে কেটে ফেলা হয়েছিল
প্রথাগতভাবে, যাতে কোনো নারীর প্রতি ভালোবাসায়
কলুষিত হতে না পারে। যার দৃষ্টি অচল হয়েছে পুরু চশমা
চোখে দিয়েও – কেননা কখনো আলো প্রবেশ করেনি
সে চোখে। সেই চোখ দিয়ে প্রাচীন গ্রন্থ খুলে সে শুধু অনুভব
করতে পারে, সাদা পৃষ্ঠায় রাশি রাশি কালো মেঘ ট্রেনের
মতো ছুটে যাচ্ছে মহাশূন্য বরাবর। তারপর তার বাণী
জবাই করা পশুর মতো কাঁধে করে বয়ে এনে তারা
উৎসব করে খায় আর সে মৃত বাণীর দাপট দেখায়।

সিন্দুকে গ্রন্থ প্রণেতার কঙ্কালের সাথে তার প্রাচীন গ্রন্থও
চিরকাল ধরে ঘুমায়। সহসা কোনো এক রাতে একটা
ধেড়ে ইঁদুর সিন্দুক খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে সব
তছনছ করে কঙ্কালের পাঁজরের তলে প্রসব করে
একহালি ছানা, যারা এই মানব সম্প্রদায়ের মতো
ছিল না আলোবিদ্বেষী, বরং ছিল ভীষণ আলোপ্রত্যাশী।

মিডিয়া

যেমন আয়নায় তাকালে অক্ষরগুলো
উল্টা দেখা যায় –
এ-ও এমন সমকালের আয়না
যার দিকে তাকালে সবকিছু ধাঁধা মনে হয়।
মনে হয় তুমি হেঁটে যাচ্ছ সমুদ্রের ঢেউয়ের
ওপর দিয়ে আর আমি মাছ হয়ে
শুয়ে আছি তোমার পরিত্যক্ত বিছানায়।
ভীষণ শ্বাসকষ্টে ছটফট করছি।
কারণ আমাদের জানালায় ছিল না কোনো
সত্যিকারের হাওয়া। বাগানে চিরসবুজ পাতা
ছিল আসলে প্লাস্টিকের গাছে। গান-গাওয়া
পাখিটাও ব্যাটারিচালিত।
আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ লোকগুলোর
ঠাঁই মিলেছিল জেলখানার গরাদে
আর হিংস্র লোভী যারা, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল
সিংহাসন কাঁধে করে অবাধে।

মুরগি ঘরে গেছে, মোরগ বসে আছে

মুরগি ঘরে গেছে, মোরগ বসে আছে –
রাত্রি থমথম, ঘুরে বেড়ায় এসময় কেবল
পাগল ও সাহসী। সমুদ্রের রুপালি মাছ
ঈগলের প্রতিবেশী। ঝড়ের পিঠে সওয়ার হয়ে
সমুদ্র যায় আকাশের ঠিকানায়। এদিকে মোরগ
বসে আছে ঠায়। যদি বিক্রি হয়
আরো দু'একটা ঘাস লতাপাতা। এই গ্রীষ্মের
দাপটে সে কিনতে পারবে দুইটা ছাতা।

মুরগি ঘরে গেছে, মোরগ বসে আছে –
চোখে তার টক টক কচি আমের মতো ঝুলে আছে
খুচরাখাচরা স্বপ্ন। মাঝে মাঝে আধোঘুমে
নর্দমার তলা থেকে ঝলকানি দেয় ধনরত্ন।
গ্রামের মনু গ্রামেই ভালো, শহরের লোক শহরে
চাঁদাবাজ ধরতে এলে লুকিয়ে যেয়ো কবরে।
মুরগি বসে আছে ভাত বেড়ে, মোরগ হয়ে গেছে
অন্য কারো খাবার। জাদুর শহরে গুম হওয়ার
কালোজাদুই তাকে করে দিল সাবাড়।

যে গাছ ব্যথার স্বাদ ভুলে গেছে

মানুষ তো সাপের মতো – বারবার খোলস বদলায়।
গাছের মতো – বারবার নিজেকে সাজায় নতুন পাতায়।
প্রকৃতির সবার মধ্যেই হয়তো এই ব্যাপারটা আছে।
এক জীবনে বহুবার জন্ম নেওয়া আর মরে যাওয়া –
মরে যাওয়া কঠিন হলেও সে আছে বলেই
আবারও জন্মানোর তৃষ্ণা নিয়ে মানুষ জেগে ওঠে
চরের উর্বর মাটিতে কোনো জংলি বীজের অঙ্কুরের মতো।
প্রতিবার তোমাদের প্রেমে মৃত্যুদণ্ড পেয়ে আমিও সেই
অসহায় আসামিটার মতো খুঁজেছি বেঁচে যাওয়ার
অকুণ্ঠ কৌশল। আর না পেয়ে মরে গেছি ফুলহীন মর্গে।
তারপর আবারও চরের উর্বর মাটিতে জংলি বীজের
অঙ্কুরের মতো জেগে ওঠা। নিজেকে ভালোবাসা, ভালোবাসা
সূর্যের সোনালি আলো, রংধনু রঙের ধুলো, পাতার
ডগায় বৃষ্টির কণা। ভালোবাসা সবাইকে, সবকিছুকে।
কারণ এ সবের মধ্যে আমি আছি, আমি ছড়িয়ে থাকি
পৃথিবীর কোণে কোণে। শুধু থাকি না তোমার আঁধার গুহার
মতো হৃৎপিণ্ডে। সেখানে থাকে কিছু পরিযায়ী পাখি।
একটা বড়ো কচুপাতায় নিজের দীর্ঘশ্বাস ঢাকি।
পিছু ফিরে দেখি আমার বেদনারা আনন্দনৃত্য জুড়ে দিয়েছে
সারা রাস্তা জুড়ে। আমি তাদেরকে দুঃখিত হতে বললে
তারা আরো জোরে চিৎকার করে গান গাইতে থাকে আর
নাচতে থাকে। তারপর আমি আমার প্রাচীন বেদনার গায়ে
হাত বুলাতে গিয়ে দেখি, সে একটা মরিচা পড়া বুলেট হয়ে
গেঁথে আছে লেবুর খোসার মতো কচি সবুজ পাতায় পল্লবিত
গাছটার বাকলে। যে গাছ ব্যথার স্বাদ ভুলে গেছে।

লোকটা বাংলাদেশেরই একটা লোক ছিল

পকেট ভর্তি ট্যালেন্ট নিয়ে সে হাঁটছিল
পথে পথে। কিন্তু তার পকেটে কোনো
ট্যাকা ছিল না। তাই ট্যাকা হারানোর
ভয়ও তার ছিল না। যাবতীয় সম্পদ সে
লুকিয়ে রেখেছিল মগজের নির্জন ভল্টে
আর পথে পথে হাঁটত নিশ্চিন্তে
যেন সে নিঃস্ব এমন ভান করে।
সারাজীবন সে পান করেছিল শিশিরের জুস
আর খেয়েছিল বাতাসের ফ্রি ঝাপটা।
না খেতে পেয়ে তার পাকস্থলী পিঁপড়ার পাকস্থলীর
মতো সরু হয়ে গিয়েছিল আর অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণে
তার মগজ মোটাসোটা একটা ভেড়ার মতো
বড়ো হয়ে উঠেছিল। এমন ভারসাম্যহীন একটা
শরীর নিয়ে সে অগস্ত্যযাত্রা করেছিল।

লোকটা বাংলাদেশেরই একটা লোক ছিল।

আমি এখনো জন্মাইনি

যা কিছু ঘটে যায় রৌদ্র সীমানায়
তা যেন অন্য কারো জীবন,
অন্য কেউ দিনলিপি লিখছে কষ্টের পৃষ্ঠায়।
পদ্মপাতায় আকাশ গলে জল
পড়ছে, পড়ছে – ভাবলেশহীন।
পিছিয়ে কিংবা এগিয়ে যাই প্রতিদিন, ভ্রুক্ষেপহীন...
তোমার আমার পার্থক্য ঠিক কতটুকু? তুমি কি সবসময় সঠিক?
আমার একাকিত্ব তোমার ভুবনসেরা উপহার।
প্রকারান্তরে তুমিও পেঁচিয়ে যাও সিসিফাসের ফাঁদে।
নাগরিক জ্বালার জানালায় দৃশ্য কাঁদে,
পার হয় ফাঁকিবাজ মহাকাল
আমাকে স্থির সেতু করে তার পায়ের তলে।
এখানে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা: নিজেকে হত্যা!!!
কিন্তু তা নয় আত্মহত্যার মতো রঙিন মিথ্যা।
অন্যের চোখের দূরবিনে আমি নেই
আমার চোখে নেই অন্য
শুধু পণ্য মাতলামি করে আর আমি
সে পণ্য গড়ার নগণ্য হাতিয়ার।

যা কিছু ঘটে যায় নির্বাক নির্মমতায়
তা হলো রূপহীন এক রূপকথা,
অন্য কারো ডানার শেকল আমাকে ছুঁয়ে দেয়।
এখানে শিশুরা খেলে ভয়াবহ অস্ত্র নিয়ে,
আগুন শিশুদের প্রিয় রং।
সবুজ দ্বীপপুঞ্জ পুড়ে গেছে মরুভূমির লেহনে,
শুধু কিছুটা ফিকে সবুজ আছে পেছনে
স্মৃতির দেয়ালে শ্যাওলা হয়ে।
যা কিছু ঘটে যায় ঘটনা পরম্পরায়

তা ভীষণ অচেনা লাগে,
অন্য কারো জীবনের বোঝা চাপানো আমার মাথায়।
পৃথিবী এখনো একটা চারাগাছের ভবিষ্যৎ ফল;
আর আমি হই সেই ফলের পরিণতি সন্ধানী
দুরারোগ্য, প্রেমিক পোকা।
আমি এখনো জন্মাইনি।
আমি এখনো জন্মাইনি।
নিস্তব্ধতার সমুদ্র পাড়ি দিতে দিতে
জন্মান্ধ গাংচিল কর্কশ প্রতিধ্বনি কণ্ঠে
ডাকছে তোমাকে আর আমাকে –
অন্য কোনো ফাগুনের আহ্বানে
ওপেন এয়ার কনসার্টে।

হঠাৎ একটা ছোট্ট ঘুম

এই ক্লান্তির সুরেলা বিছানায় বলা নেই কওয়া নেই –
হঠাৎ একটা ছোট্ট ঘুম চলে আসে।
রং থেকে উঠে আসা হাত, কিছু রঙের জন্মদাগ
সেখানে নিরিবিলি শুয়ে আছে। যে কাজটা
পাতানো আছে কাগজে, সে-ও খানিকটা ঘুমিয়ে নিক এই ফাঁকে।
আর আমি দুই চোখ ভর্তি চকোলেটের মতো ঘুম নিয়েও
জেগে থাকি। নিজেকে প্রবোধ দিই, হারিয়ে যাওয়ার আগেই
ধরে ফেলতে হবে বহুদূরে বাড়ানো তোমার হাত। মাঝি যেমন
নৌকা উল্টে গেলে ঝড়ে, গাছের শেকড় খুঁজে না পেয়ে
দুই হাতে চেপে ধরে আকাশে ঝলকানো বজ্রের শেকড়।

মানব প্রজাতির অকালপ্রয়াণ

কবিতা লিখে আর কী হবে?
ছবি আঁকলে বা কী, না আঁকলেই কী?
গানটা থামা প্লিজ গান গাওয়ার পাখি।
মানুষের পোষ না মানা এই গ্রহে
মানুষের জীবন যদি না থাকে...
যত্ন করে রাখা প্রতিটা বইয়ে আগুন
জ্বললেও নিভবে না মনের গোরস্তানে
তুষারচাপা এ দাবানল। সবগুলো ছবি
নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেও থামবে না
মগজের নিঃশব্দ সিনেমা হলে উটকো কান্নার গতি।
শিউলিঝরা সকালে ঈশ্বরকে সুপ্রভাত জানায়
বিধবা রঙের খবরের কাগজ – তার বৈধব্যের কারণ
অকারণে মানব প্রজাতির মৃত্যু সংবাদ!
তোর বাবা গেছে যুদ্ধ করতে –
ঘোর সন্ধ্যায় কী দুঃসহ প্রসব ব্যথা!
ডাক্তার নয়, নিজের ডাক্তার আজ নিজে
ইলেকট্রিসিটিবিহীন পথে একটা জোনাকির সাথে
তাকে খুঁজে পেতে পৌঁছাই মুমূর্ষু যুদ্ধক্ষেত্রে।
অন্ধকারে মরা শবগুলো করছে শীৎকার
গত জন্মে প্রকাশ করতে না পারা স্তূপ স্তূপ অভিমান:
আহহ, আহহহহ, উমমমমমমমম, আহ, আহহ, আহ...
সেই সাথে তোর সদ্য জন্মের তারছেঁড়া কান্না
যেখানে ধ্বংসের বোমা সেখানেই সৃষ্টির মাতাল তাড়না।
তোর নাম রাখি আমি জন্মান্ধ কবিতা...
কবিতা লিখে আর কী হবে?
ছবি আঁকলে বা কী, না আঁকলেই কী?
গানটা থামা প্লিজ গান গাওয়ার পাখি।
মানুষের পোষ না মানা এই গ্রহে

মানুষের জীবন যদি না থাকে...
মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিটা আঘাত
আগ্নেয়গিরি গলে নামা লাভার প্রবল ঢেউ।
যে ঢেউগুলো মহাকালের ফুঁয়ে ঠান্ডা মমি হয়ে
ঘুমিয়ে পড়ছে আমাদের অনুতাপের
ক্ষয়িষ্ণু মরুভূমিতে।
আর একটা চতুর টেলিভিশন তাকে
সেলিব্রেটি বানানোর কথা দিয়ে ঘুমের ভেতরই
অকালপ্রয়াণের সাক্ষাৎকার নিয়ে নিচ্ছে।

বহুদিন

বহুদিন আমরা দূরে কোথাও যাই না
বহুদিন আমরা আমাদের হৃদয়ে ঢুকি না
শুধু উঁকি মেরে চলে যাই
সেখানে বাঘ আর হরিণের গৃহযুদ্ধ চলছে এক মহাকাল।
তাই এতিম শিশুর মতো শুকনো মুখে
এদিক-সেদিক ঘুরি। ঘুম চোখে মেঘের বিছানা
আঁকড়ে ধরতে গিয়ে রাস্তার কুকুরকে জড়িয়ে ধরি।
বহুদিন আমরা ভালোবাসি না
বহুদিন ভালোবাসা আমাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয় না
বরং হয়ে উঠি ভয়ানক সৎ, যতটা সৎ হলে
ঈশপের গল্পের মতো সমাজ তাকে মরা কাঠের
মর্যাদা দিয়ে নিয়ে যায় ফার্নিচারের দোকানে
ইচ্ছামতন আদল দিতে।
এখন আর কাছে থাকা, দূরে যাওয়া, ভালোবাসা বা
না বাসা কোনোটাই আলোড়িত করে না আমাদের।
শুধু আলোড়িত হই সেই মরা কাঠের শরীরে
যখন আকাশ ভেঙে কালো চিতার মতো বৃষ্টি নামে।

বহু আলোকবর্ষ আগের ভবিষ্যতে সমুদ্রতীরে

[বহু আলোকবর্ষ আগের ভবিষ্যতে সব যখন প্রাণহীন, ছাইয়ের নীলচে গুঁড়ো হয়ে পড়ে আছে বিশাল স্থাপনায় চাপা পড়া কোনো চিঠির মতো, তখন কয়েকটা ছায়া সমুদ্রের গন্ধ শুঁকে জন্মান্ধ নেকড়ের মতো হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল সামুদ্রিক সিজোফ্রেনিয়ার বেগুনি জলাতঙ্কে। কারণ তারা শুনেছিল, এখানেই কোনো এক পাথরের মগজে এককোঁটা শিশির হয়ে লুকিয়ে আছে প্রাণ।]

চুক্তি করে প্রেম করার মতো প্ল্যান করে বহুবার পালাতে ব্যর্থ হয়ে
হঠাৎ একদিন সত্যি সত্যি পালালাম। দূরে যেখানে কুয়াশার দূরবিনে
সমুদ্র দেখা যায়, তোমার শহরের আলোর কারখানায়
ভবঘুরে চোখ অন্ধতাই ফিরে পায়। তিমিমাছের ফসিলের
স্ট্রাকচার নিয়ে পেছনে পড়ে থাকে বাক্সবন্দি নাগরিক জীবন,
আমি তার মরণ হয়ে বিষাক্ত পাকস্থলী ছিঁড়ে বেরিয়ে যাই
সমুদ্রদানবের গর্জন শুনে ঘুমানোর ইচ্ছা পূরণ করতে।

যাত্রার মাঝখানে বারবার যাত্রাবিরতি। বিরতি পেলেই
ড্রাইভার কাশতে কাশতে ভাত খায়, তারপর পান চিবাতে চিবাতে
একটা সিগারেট ধরায়। আর আমরা শুকনো পপি ফুলের নির্যাসে
নিশ্বাসের খাল কেটে কুমির আনি। কুমির তো নিরীহ খাদক একটা প্রাণী।
যেখানে হাঙর, স্কুইড, চোরাবালি, লাল পতাকা – যাচ্ছি সেইখানে
সমুদ্র-সঙ্গমে। এখানে মানুষ আর পণ্যের সঙ্গমে রংধনুর সেতুগুলো
পুড়ে পুড়ে ছাই, ছাইয়ের সেতু ধরে আসে না কোনো
আগুনের শিখা হাতে আগন্তুক।

আয়নাটা সরে গেলে সামনে দেখি ক্যালকুলেটর জীবনের
না দেখা নীল সমুদ্র। হাজার হাজার শ্রমিক যেমন তাদের শ্রমের
ঘামরং দিয়ে টাইলসে ফুল পাখি এঁকে বানিয়েছিল তাজমহল,
সেরকম পৃথিবীর সব নীলচাষী তাদের খেত থেকে
নীলফল তুলে গুলে দিয়েছে এই সমুদ্রে। নীলের গাঢ়ত্বে কালচে হয়ে যাওয়া

পানিতে ফসফরাস জ্বলা ঢেউয়ের বর্ডার, যেন একসারি গাংচিল
একসাথে উড়ে গেল কোনো পাখি শিকারির পায়ের শব্দে।
সাথে সাথে নিঃশব্দে ঝরল একটা তারা।
পাশের বন্ধুটা বলল: উইশ কর, উইশ কর!

আকাশের বাগানে এক জায়গায় অনেক অনেক চারা গজানোর মতো
তারাদের গ্যাংব্যাং, মহাকাশে লেজার লাগানো
মৌচাকের মতো ঝুলে আছে। নিচে পাশাপাশি চেয়ারে
আমরা সিঙ্গেল কুয়োর ব্যাং, নিশ্চল চোখে তাকিয়ে দেখি
সমুদ্রের নড়াচড়া। রাতে সমুদ্রটা তারাদের থেকে নিক্ষিপ্ত আলোয়
যেন কোনো এলিয়েন টেলিভিশন। তার মাল্টিকালার
ডিসকভারি চ্যানেলে রিমোট কন্ট্রোল ছাড়াই দেখছি
যে যার জীবনের সাদাকালো ডকুমেন্টারি।

বহুপ্রতীক্ষিত প্রেম কাছে আসলে বুঝি তা খুবই সাধারণ,
যেমন সমুদ্রপারের শিশুদের কাছে বালুতে আটকে পড়া কোনো স্টারফিশ।
চোখের কালো তারায় জ্বালে না বিস্ময়ের মোমবাতি।
কাঁকড়ার পায়ের ছাপের দিকে তাকালে ঢেউ এসে ভরে দেয় বালু আর জলে।
'কারো জন্য কিছু থেমে থাকে না' – কোরাসে বাতাস বলে।
নেই আক্ষেপ পুরোনো গিটারের, আছে অপেক্ষা নতুন গানের।

ব্যাগের মধ্যে জলরং, কাগজ কলম অব্যবহৃত কনডমের মতো
পড়ে থাকে। কারণ আমরা মহাআনন্দে নিজেদের ব্যবহার করছি
সমুদ্রের প্রোটেকশনহীন মিলনে। সমুদ্রে দেয়নি তো বাঁধ
লবণচাষী। অথচ নাগরিক স্বভাবে স্বার্থের বাঁধে কম কম লবণের দানা পড়লে
চেঁচিয়ে উঠে গুষ্টি উদ্ধার করি। ঝগড়ার ঝড়ে খসে পড়ে
হলুদ পাতার মতো আলগা মুখোশ। নিজেরাই বিরক্ত হই নিজেদের ওপর।
ঝড় থেমে গেলে রোদ পড়ে ভাঙা পালে, জংলি শূকরীর ছানাগুলো যেমন
স্তনের ভাগাভাগি নিয়ে যুদ্ধ করে শেষপর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে
একজন অন্যজনের শরীরের গোলাপি পশমে।

ঝাউবনে ছায়া নামে সবার আগে। সেই ছায়া লেগে অন্ধকার আমাদের মুখ।
মাকড়সার মতো যে রঙিন উলের গুটি ছাড়তে ছাড়তে
চলে গিয়েছিলাম সমুদ্র, নাকি সামুদ্রিক তৃষ্ণার কাছে,
তা গোটাতে গোটাতে ফেরার পথ ছোটো হয়ে আসে।
কাছে চলে আসে জ্যাম, ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতাবোধ, হৃৎপিণ্ড জুড়ে
গজিয়ে ওঠা ক্যাকটাস। তবু জেনে গেছি ফেলে আসা সমুদ্রতীরে
কোনো এক পাথরের মগজে
একফোঁটা শিশির হয়ে লুকিয়ে আছে প্রাণ...

রিঅ্যাকটিভ

বাঘটা হরিণটাকে শিকার করে
আরাম করে খাচ্ছিল।
হরিণ বলল: উফফফ...
বাঘ বলল: তুমি খুব রিঅ্যাকটিভ!
বাঘরা হরিণ খাবে
হরিণরা খাদ্য হবে – এটা তো চিরাচরিত।
হরিণ কষ্টে মুখ বুজে আকাশের দিকে তাকাল।
বাঘ বলল: দেখছ, আকাশও নীরব
আর নীরবতা সম্মতির লক্ষণ।
তুমি আমার খাদ্য হবে এটাই নিয়ম বেইবি,
তাই কোনো রিঅ্যাক্টই করতে পারবা না।

রাগ

চোখ থেকে ধোঁয়ার মতো, কেটলির জলীয়বাষ্পের মতো এঁকেবেঁকে
যেতে যেতে রাগগুলো পেটের সমুদ্রে এসে পড়ে। পেটের মধ্যে গুড়গুড়
করতে করতে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে প্রাচীনকালের কোনো প্রেতাত্মার মতো।
রাগ আমার মাথায় ল্যাটকা মেরে বসে আর হিহি করে হাসে,
আমি আরো বিরক্ত হয়ে উঠি। ইচ্ছা করে ভেঙে ফেলি
কাচের পৃথিবী। কিন্তু না, আমি রাগের সমুদ্র থেকে ডুবসাঁতার দিয়ে
ভেসে উঠি পরিত্রাণের সমুদ্রে। মাথায় হাত রাখে বুদ্ধ
কিংবা আলিঙ্গন করে কোনো জেন সন্ন্যাসী। বলে, ওম শান্তি!
তখনই চোখের আকাশ জুড়ে কালো মেঘ ঘন হয়ে বৃষ্টি নামে।
পৃথিবীতে আমাদের পেরিয়ে যাওয়া বয়স মহাকাল চুপি চুপি
এসে ফেরত দিতে চাইলে বলিঃ বাবা দরকার নাই।
তোমার সময় তুমি ভক্ষণ করো যত খুশি। শয়তান যেমন
ভক্ষণ করে নিজ সন্তান। আমি ভুল শোধরাবার
দলে নাই, ভুলগুলো মেনে নিয়ে এখন সামনে যেতে পারলেই বাঁচি।

আজ আমার ভালোবাসতে ইচ্ছা করে

আজ আমার ভালোবাসতে ইচ্ছা করে সবাইকে।
যারা পিঠে এসে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে গাছটার –
তবু সে আততায়ীকে ছায়া দেয় বনভূমি।
আজ আমার ভালোবাসতে ইচ্ছা করে সবাইকে
যেন আমার হৃদয় পুকুরপাড়ের সেই বিশাল
সফেদা গাছ, যে আশ্রয় দেয় সব প্রজাতির পাখিকেই।
সমুদ্র যত জোরে আঘাত হানুক, তীরে আঁকা ছিল হাসিমুখ।
এইসব বিদগ্ধ সন্ধ্যারা জানে আকাশ পুড়ে গেলেও
জলের আয়নায় ভেসে থাকে আরো মহাকাশ।
ভালোবাসা ঘন ঘন ডাকে যখন ক্ষমা করে দিতে দিতে
তুমি নিজে হয়ে যাও সুখী এক কিশোরীর পালিত রাজহাঁস।

রূপান্তর

মাটির গভীরে মাথা ডুবিয়ে
মাটি কিছু ভাবছিল।
মাটির হৃদয় খুঁড়ে কুমার উপড়ে আনল তাকে, অজান্তে।
একতাল মাটি...
আকৃতিহীন, তাকে আকৃতি দেয়া হবে।

রূপান্তরের বেদনা কি জানো তুমি?
কিংবা আমি কি পারি অন্যকে জানাতে?
জাগতিক যত সাইন ব্যবহার করে
চৌকস তুমি কিন্তু ব্যর্থ তুমি।
সবচেয়ে বোধগম্য সাইন যখন নীরবতা।

মাটির মৃত্যুর পর জন্ম প্রক্রিয়া শুরু পোড়ামাটির।
একটা রক্তাক্ত হাত জলের কলে ঘুরিয়ে চলে
শিল্পের কবন্ধ চাকা।
জ্ঞানহীন পটটাকে শুকাতে রেখে দেওয়া হয়
সূর্যের আকাশি ব্যান্ডেজে ছাওয়া রেফ্রিজারেটরে।
আকাশি অ্যাপ্রন পরা সেবিকারা রেফ্রিজারেটরের সবুজাভ বাষ্পে
ভেসে ভেসে ছেঁকে নেয় অতীতকালের মায়া।

এই বিচ্ছিন্নতা কি কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত?
তুমি নাকি আমি ক্ষতিগ্রস্ত?
তুমি নাকি আমিই সহিংস?
আর ব্যক্তিগুলো মৃত বাক্স।
দুই ডানার মাঝখানে প্রজাপতি জমায়
মৃত্যু রঙের পরাগ।
বিচ্ছেদের থার্মোমিটারে পারদ নাই,
পরাগের ওঠানামা...

কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন দেখার জন্য
বারবার ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা?
কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত ড্রইংয়ের জন্য স্কেচবুকের
জড় পাতায় মগ্নে তৈরি পৃষ্ঠা ছেড়ে
অর্ধেক পোড়া নিসর্গের দিকে সরে যাওয়া?

অর্কেস্ট্রার ফুলেল গুহায় উঁকি দিতেই
শ্বাপদ জন্তুর মতো তেড়ে আসে
গুহার দেয়াল। আবারও বোল্ড আমি –
কোল্ড হয়ে যেতে যেতে ভাবি,
কোরাস শুধু এক ভ্রান্ত মনের খেয়াল!

অ্যান্টিবায়োটিক

দাঁতের ব্যথায় ডাক্তার শুধু দেয় অ্যান্টিবায়োটিক,
ইনফেকশন তবু যেতেই চাচ্ছে না –
জীবনেও আমার দরকার কিছু মোটাতাজা অ্যান্টিবায়োটিক
জীবনের ঘা আরো বেশি দীর্ঘস্থায়ী –
কিন্তু এত অ্যান্টিবায়োটিক গিলে কিডনি তো যায় যায়
বলি ও কবি, কী দৃশ্য দেখো তুমি লোকাল বাসের জানালায়?
ভারী চশমার কাচ গলিয়ে ঘুড়িগুলো হালকা বাতাসে উড়ে বেড়ায়।
একখণ্ড অখণ্ডতা হারিয়ে গেছে এই শহরে –
তাকে পাওয়া যাবে কয়েকটা টুকরায় ভালোবাসার ছদ্মনামে।
ঘাতক যেমন প্রতিহিংসায় তার শিকারের লাশ
ছড়িয়ে রাখে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে।
প্রেমিক, তুমি খুঁজো না প্রেমের পূর্ণতাকে
অবিশ্বাসের বিশ্বাসে তুমি আস্থা রাখো দৃঢ়।
সাগর করেনি কখনো কার্পণ্য
তবু সে মরুভূমির বুক খুঁড়েই তুলতে চায় তৃষ্ণার জল –
অবিকল করুণ তাই ফলাফল।
বিয়ের সময় মানুষ এত সুন্দর করে সাজে
কিন্তু আমি জানি একাকিত্বের কোনো বিউটি পার্লার না থাকলেও
তার সৌন্দর্য মেকাপ দেয়া সৌন্দর্যের চেয়ে বহুগুণ গাঢ়।

সূর্যের প্রখর আলোতে

সকাল, তুমি এমন নিষ্পাপ মুখে বলো না শুভ প্রত্যুষ!
ফুল ফোটানোর সব কসরত ভেঙে পড়ে দুঃস্বপ্ন ভেঙে গেলে।
কোকিলের কথা সত্য জানি প্রকৃতির সবুজাভ দ্বীপে
কিন্তু মানুষ প্রকৃতি ছেড়ে চলে গেছে তার রোবট রাজকুমারীর ঘুম ভাঙাতে...
পাশ ফিরে শুয়ে থাকে হতবাক নিশ্বাস...
সময়ের হাড়ক্ষয় রোগ তাই ঘড়ি নিজেই নিয়েছে পালাবদলের চাকরি
আমি সব চাকরি হারিয়ে ভাবি কীভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচি।
কমলালেবুটা কখন জানি নিজেকে ভরিয়ে রেখেছে তেতো রসে
সারি সারি কমলার বাগান অচল পড়ে থাকে শুধু রঙিন সৌন্দর্য নিয়ে –
প্রেম উদ্বুদ্ধ করে প্রতিশোধে...
গর্ভ সঞ্চার না হওয়া কুমারী পেটে শুকিয়ে যায় বকুল ফুলের মালাটা।
প্রতিশোধ নিভে যায় সাগরের ঢেউয়ে নামা আচমকা বৃষ্টির চুমুতে...
পুরানো খোলসগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায় আর
নতুন ঝিনুক মুক্তা জন্মানোর আশায় আরো শক্ত করে
বুজিয়ে রাখে দুই খোলস।
আমি সেই মুক্তা ফলানো আর না ফলানো ব্যর্থতার অব্যর্থ দর্শক...
দর্শকের নাকি কাঁদতে নেই সিনেমাহলে গিয়ে।
কান্নাগুলো লুকিয়ে ফেলি যেভাবে পাতারা লুকিয়ে ফেলে শিশিরকণা
সূর্যের প্রখর আলোতে।

যুদ্ধ ফুরায় না

দোজখে শর্ট সার্কিট হয়ে অসংখ্য আগুনের ফুলকি
ঝরছিল যখন পৃথিবীর বৃষ্টি হয়ে
তখন আমরা তৃণভোজী ভ্যাম্পায়ারের মতো নিষ্পাপ ডানার উড়ালে
বিড়ালের থাবার মতো গোল ধূলিঝড়ের আতশকাচে
চোখ রেখে দেখতে পাচ্ছিলাম
প্রজাপতি ডানার পাতাওয়ালা একটা ক্রিস্টাল বটগাছ।
আগুনের বর্শা হতে পিঠ বাঁচাতে
আমরা সব জড়ো হলাম সেই গাছের ডালে ডালে।
আর সাথে সাথে তড়িতাহত হয়ে মারাই গেলাম সেখানে।
মানে ওটা ছিল মূলত একটা বৈদ্যুতিক টাওয়ার।

টাওয়ারটাতে আমাদের লেপ্টে থাকা মৃতদেহ
যেন দেখাচ্ছিল স্বর্গের বাগানের জুসি কোনো ফল।
কিছু শিশু শ্রমিক কারখানায় যাবার পথে
কোলাহল করতে করতে দেখতে পায় ফলগুলোকে।
ছিঁড়ে খেতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অক্কা!
শিশুগুলো ওখানে মারা যায় বিষাক্ত সুন্দর বুনোফুলের মতো মুদ্রায়।
ফুলগুলো ঝড়ের হাত ধরে নাচতে নাচতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে
সমুদ্রের শিরায় শিরায় নাচতে থাকে জলকামানের মতো।
ফলে সমুদ্রে সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুতের জাল।

সেই জালে এক অন্ধ জেলে জাল ফেলতেই
পুরো সমুদ্রটা উঠে আসে তার জালে।
বিরক্ত জেলে জাল থেকে সব জল ঝেড়ে ঝেড়ে
ঝরিয়ে ফেলতেই অনুভব করে রাশি রাশি হাড়।
অন্ধ জেলে এখনো তার জাল থেকে হাড় বেছে চলছে,
যত বাছে তারও চেয়ে অনেক অনেক বেশি হাড়
একেকটা যুদ্ধরোবট এসে কয়েক দফায় ক্রেন ভর্তি করে
বেচারা জেলের অগোচরে ঢেলে দিয়ে যায় সমুদ্রগর্ভে।

পাথর ও পাথরের নৌকা

পাথর

আমাকে ব্যবচ্ছেদ করো।
দেখো আমার ভেতরে এক বিরতিহীন স্বপ্নযাত্রা।

পাথরের নৌকা

জীবিতের লক্ষণগুলা মুঠোতে ধরে রাখলেও
নদীটা আসলেই মৃত।
জল হয়ে যাওয়া রক্তের ফ্যাকাশে আয়নার কাছে
সে এই সত্য স্বীকার করে।
আর কতক্ষণ? কতদূর?
সূর্যের থকথকে ছায়া চোখ থেকে মুছে
মাপকাঠির মরীচিকা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে
জোছনার বাঁধভাঙা সড়কে
কাঁটার মতো আটকে থাকে
পাথরের নৌকা।

চলো হায়েনা হয়ে যাই

আমার বন্ধুর এক কান দিয়ে একটা ছুরি ঢুকে
অন্য কান দিয়ে বের হয়ে গেছে।
সেই অবস্থাতেই সে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে।
ওর যন্ত্রণা আমি বুঝতে পারি, কারণ
একসময় আমারও কানের মধ্যে ছুরি গেঁথে গেছিল।
রাস্তায় একটা বাচ্চা ছেলের মাথার উপরের অংশটা
কে যেন কেটে নিয়ে গেছে;
এখন তার মাথাটা একটা পাত্রের মতো দেখতে
আর সেই পাত্র বাড়িয়ে ধরে সে
ভিক্ষার পয়সা কুড়াচ্ছে।
বাচ্চা ছেলেটার কষ্ট আমার বন্ধু বুঝতে পারে।
কারণ ছোটোবেলায় ওর মাথার উপরের দিকটাও
কেউ একজন নাকি কেটে ফেলেছিল।
পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা জরায়ু চেপে ধরে
এক মহিলা বাসে মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করছে।
তার নাকি প্রসবের সময় পেটের মধ্যে
শিশুর বদলে একটা জলজ্যান্ত কঙ্কালকে
শুয়ে থাকতে দেখে ডাক্তার আর সেলাই করার সাহস পায়নি।
এই মহিলার দুঃখ যাত্রীসিটে বসা
উশকোখুশকো একটা মেয়ে অনুভব করতে পারে। কারণ,
তার মায়েরও এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, সে যখন অনেক পিচ্চি।
একটা শুকনো সবুজহীন গাছে শকুন বসে বসে পালক খুঁটছে।
বারান্দায় ইজিচেয়ারে সূর্যটাকে ফুটবলের মতো কোলে নিয়ে
রিটায়ার্ড আঙ্কেল মৃতপ্রায় গাছটার আত্মায় ঢুকে যায়।
কেননা, তারও যে প্যারালাইসিস!
তিসিখেতে কাজ করার সময় ক্রসফায়ারে অকালমৃত্যু
হয়েছে কৃষকের ছেলের। কৃষকের বেদনা পাশের গ্রামের
মাঝি বুঝতে পারে। কারণ তার মেয়ে

গার্মেন্টসে আন্দোলন করতে গিয়ে অপহৃত হয়ে নিখোঁজ আছে।
রক্তশূন্যতায় বিবর্ণ এক কিশোরী
চাঁদের বেহুঁশ আভায় ঘাটে এল পানি নিতে।
কিশোরীটার অপুষ্ট দেহের দুর্বলতা নদী জানে। কারণ
তারও জল শুকিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।
অন্ধকারে থোকা থোকা কালো জামের বেগুনি মধুতে
চুমুক দিতে এসে জালে আটকা পড়ল বাদুড়ের ঝাঁক।
তাদের অসহায়তা উপলব্ধি করতে পারে
কারাগারে বিনা বিচারে পচতে থাকা কিছু লোক।

এখানে সবাই সবকিছু জানে
অভিজ্ঞতার দহনে।
এখানে আলাদা, ব্যতিক্রম বলে কিছু নাই।
তোমার আমার জীবন একই কক্ষে পরিচিত আবর্তন।
আমাদের অবমাননা, অস্বস্তি, বিলাপের অসুখও একটাই।
তাই চলো একসাথে অসুখটার উপর অতর্কিতে
ক্ষুধার্ত, বিকৃত হায়েনার মতন আক্রমণ করি...

পিয়োর সুইসাইডাল মোমেন্ট

না, আমাকে ফিরে আসতেই হবে
এইসব ঝুলে পড়ার বিরুদ্ধে,
সমস্ত থমকে যাওয়াকে পজ দিয়ে
আর শয়তানের কণ্ঠকে
জন্মদিনের বেওয়ারিশ সূর্যের মতো নিভিয়ে
ফিরে যেতে হবে যে মঞ্চে অন্ধতা বিশ্রাম নিচ্ছে।
সেই মঞ্চের পেছন দরজায় সারাক্ষণ
তুষার প্রপাতের মতন নক্ষত্র ঝরতে থাকে
কালো সমুদ্রের স্বেচ্ছাচারী ডানায়।
নিঃসীমতার বায়ুপ্রবাহ ওড়ায়
রঙিন ফেনার অভিযোগের গান।
কিন্তু সে গান শুধুই নৈঃশব্দ্য বর্ষণ করে
সমুদ্রতলের শৈবাল চরে
আহত নীলতিমির চেতনার ক্যামেরায়।
তার ক্ষতস্থান থেকে লাল মেঘের রক্ত
নীলাকাশ জলে মিশে
হয়ে যায় বেগুনি যুদ্ধের ধাঁধা।
ডাক্তার নিজেই আরোগ্য খুঁজে
বের হয়ে গেছে হাসপাতালের গন্ধ ছেড়ে।
মাঝরাতের তারায় তারায়
মাঝির বউয়ের কুপি জ্বালা প্রসব বেদনায়
কোনো সেবিকা কিংবা মাদার তেরেসার প্রেতাত্মা
ছুটে আসে না পারলৌকিক ভরসায়।
নীলতিমি! হও তুমি নিজেই নিজের
প্রেমিক, ঈশ্বর এবং ডাক্তার।
নিভৃতে যে রোগে সে রোগাক্রান্ত
তা আসলে তার নয়,
সে রোগের প্রকৃত মালিকের নাম সমুদ্র।

মঞ্চের পেছন দরজা দিয়ে কালো সমুদ্রের জল
ঢুকে পড়ে প্রথমে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের
পরে সকল দর্শকের বাহুতে
করে দেয় অসুখের শাশ্বত ট্যাটু ।

নাহ, আমাকে ফিরে আসতেই হবে
এইসব ঝুলে পড়ার বিরুদ্ধে ।
সমস্ত থমকে যাওয়াকে পজ দিয়ে
শূন্যতার স্মৃতিচারণ ধারণ কিংবা হরণ করে
ফিরে তাকাতে হবে
বৃষ্টিতে ভীষণ বিশৃঙ্খল রাস্তায় ।
সবুজ অ্যাঞ্জেলরা সেই রাস্তায়
ধুপধাপ ভিজে ভিজে
সহজ সরল জীবনের স্বপ্ন দেখায়
পথভ্রান্ত পথিকের জ্যামে বসা জানালায় ।

আধুনিক নাগরিক হতে গিয়ে হারিয়ে গেছে তোমার পৃথিবী

দুপুরের কড়া রোদ জানালার গ্লাস ভেঙে
ঘরের ভেতরে ডাকাতি করতে আসে
শীতে কেঁপে মরা রক্তকণিকা।
কালো পর্দায় আমি ঢেকে দিই জানালা।
কপাট বন্ধ করে বিশ্বাস করি স্বাধীনতায়।
যতদূর দেখা যায়,
দৈত্য দানবের সভ্যতা
রং-অন্ধ বুনো মহিষের মতো
আকাশে বাড়ায় মাথা।
কোনো কিশোর ঘুড়ি ওড়ায় না
নীল সুতোর হ্যাঁচকা টানে।
আকাশও তাই জীবনের মতো সমতল।
জীবন বইয়ের প্রচ্ছদে চাপা পড়া
সাদাকালো লিপিকার বোবা গর্জন।

তোমার ঘরে ছিল একটা পুরোনো লোহার খাঁচা।
তোমার মনে ছিল নিঝুম মাছরাঙা পাখির গন্ধ।
অন্ধকারে হরিণের মতো ঘুমাত যে নদীটা,
তার আয়নায় মেঘ হয়ে ইচ্ছে উড়ে যাওয়া।
ঘন বৃষ্টিতে ডুবে যেত ছোট্ট শহর।
হাঁটুজলে মাছ ধরত বস্তির অ্যাঞ্জেল।
দেয়ালের পাশে রোদের আদরে হাসত রক্তজবা।
বাইসাইকেলে স্কুল ফাঁকি দিয়ে সবুজে উধাও হওয়া...

আধুনিক নাগরিক হতে গিয়ে
হারিয়ে গেছে তোমার পৃথিবী।
তুমি সেই পৃথিবীর প্রতিবাদের চাতালে
শেকল জড়ানো এক মায়াবী
জীবন্মৃত স্মৃতি।

নিজের পৃথিবীর দিনরাত ছেড়ে আসা
অন্য পৃথিবীর উদ্বাস্তু পরজীবী।
যেখানে ঘণ্টা বাজলে যন্ত্রের বাগানে
শ্রমিকগুলোকে অনিচ্ছার পাপড়ি গেঁথে
ফুল ফোটাতে বাধ্য করা হয়।

সাঁকো

একটা সরু চুলের মতো সাঁকোও আর অবশিষ্ট নাই
পৃথিবীর কোথাও, অন্তত তোমার আর আমার মাঝে।
এখন আবার পরস্পরকে চিনতে হলে
অপরিচয়ের পাহাড় ঠেলে, নতুন করে
জন্ম নিতে হবে আমাদেরকে। আমাদের বাবা-মাকে
পুনর্বার মিলিত হতে হবে বরফ আর আগুনের যৌথ বাসরে।
চুলের মতো চিকন কোনো একটা সাঁকোও আর অবশিষ্ট নাই।
পথে বাধা পেলে নদী বেঁকে যায়, আরো খরস্রোতা হয় –
হারিয়ে ফেলার ভয় পোষার চেয়ে তাই
হারিয়ে ফেলাতেই সাশ্রয়। সূর্যাস্তের রং কেটে কেটে মাঝি ফেরে বাড়ি।
জল থেকে যায় অন্ধকার সীমানায়। আবারও জন্মের আয়োজন
করতে বলো তোমার বাবা-মাকে। আমাদের মৃত মনের সমাধিস্থলে
গেয়ে উঠবে খঞ্জন পাখি। চোখবাঁধা কানামাছি হয়ে বনপথ দিয়ে
হাঁটতে হাঁটতে আমি তোমার দিকে যাব। কখনো আর দেখা হবে না
জেনেও তোমার শেষ স্মৃতির গন্ধ শুঁকব বাতাসে।
কেঁদে কেঁদে বৃষ্টি নামাব আর রংধনুকে বলব
তোমার বাড়ির ছাদ পর্যন্ত একটা বিশাল সাঁকো বানিয়ে দিতে।

আমি সেই রোদকেই ভালোবাসি

বেঁচে থাকা একটা সাদাকালো খাঁচায়
বন্দি রঙিন বাঘ। আর বেঁচে থাকার সংগ্রাম
সেই বাঘের খাঁচায় একচিলতে
রোদের অনুভূতি।
পণ্যের ঝড় তুফান বয়ে গেলে
রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখি উজ্জ্বল মোড়কের ঢিবি।
তোমায় খুঁজে না পেয়ে নির্বাক ওই নীলে
তোমার রঙে আঁকি বিকল্প পৃথিবী।
আমাকে ঘিরে রেখেছে অচেনা বিশালতা।
সব বিশালতায় থাকে মরুভূমির ধু ধু চেহারা।
ছোটো হতে হতে হারিয়ে যাওয়া –
বসতঘরের পাশে অপরিচয়ের বোঝা নিয়ে
বেড়ে চলছে ফেনিল অনন্ত...

লাশকাটা ঘরে অভ্যস্ত নৈঃশব্দ্যের ভেতরে
একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে।

কেউ সাড়া দেবে না জানি
এত মৃত্যু হয়ে গেলে।
কিছু অন্ধ লোক সাঁকোর ওপর বসে থাকে
মৃত্যুর ডানা মেলে।
সূর্য অস্ত যায় না, রাত গভীর হলেও।
সূর্যের দিকে তাকিয়ে চোখে জল এসে গেলে
হাত দিয়ে চোখ ঢাকি।
তবু সূর্যের দাপটই সত্যি।
দূরে কোথাও পাহাড়ের আড়ালে
কুয়াশার মতো জড়ো হয়ে নামছে বৃষ্টি।
দূরে থাকা বৃষ্টির গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।
একদিন মারা যাব, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি।

নিজেকে ভালোবাসি বলে আয়নাটা সঙ্গে রাখি।
আয়না ভেঙে গেলে অনেক কষ্ট পাই,
অবশেষে বুঝি, আমি তো অক্ষত আছি!
নির্ভরতার বিপদ পেরিয়ে
জেনো এখনো বেঁচে আছি।

বেঁচে থাকা একটা সাদাকালো খাঁচায়
বন্দি রঙিন বাঘ। আর বেঁচে থাকার সংগ্রাম
সেই বাঘের খাঁচায় একচিলতে
রোদের অনুভূতি।

আমি সেই রোদকেই ভালোবাসি।

একটি ভারাক্রান্ত দিন শেষে

চারপাশে এত এত আক্রান্ত আর ভারাক্রান্তের
স্রোত ঠেলে এগিয়ে যায় ছোট্ট তরীর মতো
তারিখ না জানা একটা দিন। ও দিন, তুমি খেয়েছ কি
সারাদিনে কিছু? একটুও কি বিশ্রাম নিতে পেরেছ?
তোমার কখনো চিরুনি না দেয়া চুলে
আমার আঙুল দিয়ে বানানো চিরুনি দূর করে দেবে
জট পাকানো যত জটিলতা। তোমার হাত ধরে
ওই নৌকায় করে নেমে পড়ব সমুদ্রে। অবিরাম কান্নার কারণে
সমুদ্রের ফোলা ফোলা চোখ আমরা ফুঁ দিয়ে
করে দেব ঝরঝরে। কানে কানে বলে রাখি,
এমন ভারাক্রান্ত দিনে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে হয় –
যাতে স্বপ্নে এসে গান শোনাতে পারে হীরামন পাখি।

আমাদের জাহাজ ভ্রমণ

মাঝে মাঝে মনে হয় এই ঘর ঘর না, এই পথ পথ না...
আসলে একটা জাহাজে চড়ে কোথাও যাচ্ছি বা অ্যারোপ্লেনে।
পৃথিবী তো একটা চলমান বস্তু বা যানবাহন
অনেকটা টাইটানিকের মতো – এই জাহাজেই খাওয়া, ঘুম
আড্ডা, চাকরি, সংসার, সন্তান পেলেপুষে বড়ো করা।
মাঝে মাঝে এই জাহাজের মধ্যের কোনো জাহাজে চড়ে
গাংচিলের দ্বীপে বেড়াতে চলে যাওয়া।
বৃষ্টি নামলে আমি ডেকের ওপরে চলে যাই, দেখি বাতাস
আর মাতাল সাগরের কাণ্ডকীর্তি। কোনো একদিন
জাহাজটা হেলে গেলে হয়তো আমি গিয়ে পড়ব তোমার সাধের
সবজি বাগানে। অথবা তুমি এসে পড়বে আমার
কালারপ্লেটের ওপরে। আমি তখন নাটোরের
বনলতা সেনের মতো চোখ তুলে বলব: এতদিন কোথায়
ছিলেন? তুমি বলবে: আরে, এই জাহাজেই তো ছিলাম!

এখন কান্দো ক্যান

ভাবছিলা এতই সোজা!
বোঝো নাই সেই সোজার মাজেজা।
সহজ রাস্তার কঠিন নিয়ম দেইখা ভয় পাইয়া
কঠিন রাস্তারে সোজা করতে করতে
এই সিসিফাসীয় পাহাড়ের চূড়ায় আইলা।
তাইলে বহু কষ্টে তোলা পাথর গড়ায়া গেলে
তোমার চোখেও লগে লগে পানি গড়ায় ক্যান?

সিনেমা

একটা সিনেমা বানাবে বলে সে বানিয়ে ফেলল
এক কুড়ি বিজ্ঞাপন।
সেলিব্রেটির ফিলিংস হলো ভরপুর
নারী হলো
বোতল ভরা ঝাপসা রাতের নৃত্য হলো
বাদুড়ের মতো উড়ে আসা অগুনতি টাকার নোট ভর করল
বাচ্চাটা বাংলা মিডিয়াম থেকে বেঁচে গেল
ইংলিশ মিডিয়ামে –
বউয়ের সাধ মেটানো কেনাকাটা হলো সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, আমেরিকায় –
তারপরও অতি ক্ষুদ্র, আতশকাচে দেখার মতো ক্ষুদ্র
একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে থাকল কণ্ঠনালীর নিচে চেপে রাখা
কান্নার মতন ব্যথা হয়ে –
একটা সিনেমা!

লাশকাটা ঘরে না বানানো সিনেমাটা একা একা রিহার্সাল করে
কোনোদিন জাগিবে না আর জেনে।

আইসক্রিম

সবাই বলে, 'মাথা ঠান্ডা করো
কুল ডাউন বেইবি'।
বলে তারা আমার হিমায়নের সুইচ
অন করে দেয়।
যান্ত্রিক কম্পনের তালে
আমি ঠান্ডা হতে শুরু করি।
নিউরনের কোষ ঘিরে
তুষারের মিহি আচ্ছন্নতা।
আর মস্তিষ্কের কেন্দ্রভাগে
একটা শৈত্যচুল্লি, যার শিখায়
আইসক্রিম তৈরি হয়।
পেঁজা পেঁজা মেঘ, রাজনৈতিক অঙ্গীকার,
রাষ্ট্র কর্তৃক নিহতদের রস,
দাবি-দাওয়া, স্বপ্নভঙ্গের আলেয়া,
জাতীয় সঙ্গীত আর রংধনু দিয়ে আমি
আইসক্রিম বানাই। মাথার ভেতর
আইসক্রিমের ফ্যাক্টরি নিয়ে
বিদগ্ধ গ্যাস চেম্বারে ঘুরে বেড়াই।

ভালোবাসা হাত ছেড়ে দিলে

ভালোবাসা হাত ছেড়ে দিলে হাত ধরে
পথের ধুলা। আর কে না জানে, ধুলাতেই মুক্তি!
তবু পোষা পাখির কাছে মুক্তিও দুঃখজনক
মনে হতে পারে কখনো কখনো। বিশাল আকাশ থেকে
পড়ে যাওয়ার ভয়, যখন আশেপাশে জড়িয়ে ধরার মতো
নাই কোনো বৃক্ষের অস্তিত্ব। খাঁচার মধ্যে পৃথিবীটা
ঢুকে বসে থাকলে একটা জীবন পাখি নির্বিঘ্নে
কাটিয়ে দিতে পারে পৃথিবীর সাথে গল্প করতে করতে।
সাথে কিছু উষ্ণ সন্ধ্যার প্রতিলিপি...
সরগরম ভিড়ে টইটুম্বুর আড্ডার আসক্তি।
তখনো তারা ঘুরে ঘুরে, গান গেয়ে ফিরে আসত খাঁচায়
কারণ ফিরে আসার জন্য একটা ঠিকানা থাকতে হয়।
আর এখন পথের ধুলাই তার নতুন ঠিকানা –
ধুলাগুলো আসলে ছিন্নমূল শিশুদের আত্মা
যারা খুব অল্প বয়সে দার্শনিক হয়ে গিয়েছে
কোনো অক্ষরজ্ঞান ছাড়াই। আমি সেই শিশুদের সাথে
শিশু হয়ে যাই, থলে হাতে পথে এসে দাঁড়াই –
দুঃখের ডাস্টবিন থেকে বেছে বেছে ছোটোখাটো আনন্দ কুড়াই।

নৈঃশব্দ্যের মৃত্যুদণ্ড

ভেতরে ভেতরে একটা নৈঃশব্দ্যের দ্বীপ নিয়ে
ঘুরে বেড়াই তারাভরা যানজটের শহরে।
এই নৈঃশব্দ্যের দ্বীপটা যদি ভেদবমির মতন বাইরে
প্রসব করে ভেতরে গিলে ফেলা যেত
আস্ত শব্দের কলরব!

শব্দের যত যন্ত্রণা স্তিমিত আজ ভুলে যাওয়া কবরে...
এই ক্ষেত্রে কবরবাসীই বেশি ধনী
আমাদের জড়ো করা সমগ্র যান্ত্রিক উপহারের চেয়ে।

তুমি ছুঁয়ে আছ বরষাস্পর্শিত পদ্মের সরোবর...
আমার হাতের রেখায় নদীগুলো মরুভূমি-কীর্তন
গায়। ঘুমের শিয়রে প্রভা আনে
অস্বচ্ছ কাচ। আমার জীবন আজন্ম এক বন্ধক নেয়া
প্রতিবন্ধকতার ম্যাজিক বক্স। তুমি, আমি সব মিলে মিছিলে
আরো আলো, অতসী আঁধার চেয়ে মুখর।

শুনতে পাচ্ছি না কেউ কারো স্বগতোক্তি –
নিজের চিৎকারটাও ডুবে যাচ্ছে মাঝসমুদ্রে।
সব মাছ একা জালে ধরে হোয়াইট হাউজে
এক বোবাকালা প্রেসিডেন্ট কানে তুলা গুঁজে
ডেথ মেটাল শুনে যাচ্ছে।

আমার কানে বাড়ছে সিসার বংশবিস্তার –
বহুদূর পাহাড়ের গায়ে একলা একটা ঘর
পূর্ণিমায় আড়বাঁশি বাজায়।
তারারা ঘন হয়ে সেই বাঁশি শুনতে নেমে আসে কাছে...

তোমার ঘুম ভাঙে অ্যাম্বুলেন্সের সুশ্রাব্য বিপদ সংকেতে।
তোমার স্বপ্নে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুরা
বোমা আর মারণাস্ত্রের ঘুমপাড়ানি গানের তালে
আবার ঘুমিয়ে যায় –
অনন্ত নৈঃশব্দ্যের ছাই বিছানায়।

এক জন্মান্ধ কঙ্কাল

কিবোর্ডের সাদাকালো অক্ষরগুলো ঝাপসা চোখের সামনে
রংধনু জড়ানো প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়ায়। কিন্তু তার কোনো শখ নাই
প্রজাপতি ধরার। টেবিলে অহিংসুক কাঁটাচামচের মতো মেলে দিয়ে দু'হাত
শুনে যায় সে দূর বনে শূন্যতার মাইক্রোফোনে বাজা ঝিঁঝির ডাক।

আমি বলতে চাই না আর কোনোকিছু
শুনতে চাই না কোনোকিছু
জানতে চাই না কোনো প্রগতির দুর্গতি, তথ্যের মহামারি
নক করতে চাই না কারো নিঃসঙ্গতার নগ্ন ক্যানভাস।
দেহের ভেতরে মৃত মনের সৈকতে পড়ে আছে
ঝাঁকে ঝাঁকে ফ্যাকাশে রঙা অক্টোপাস।
তবু ছুটি নাই, দেয়াল ঘিরে নাচানাচি তুমুল শোরগোল...
প্রখর দুপুরে রিকশার ভারী চেইনের মতো ঘুরে চলে অনর্থক জীবন।

ঘরের চালা বেয়ে বৃষ্টির ধারা পড়ে পড়ে
ঘরের চালা বেয়ে বৃষ্টির ধারা পড়ে পড়ে
ঘরের চালা বেয়ে বৃষ্টির ধারা পড়ে পড়ে একটা শূন্যের আকার।
একটা চোরাগুহা নাই কোথাও পালাবার।
এখানে অসুখ, এখানেই শুশ্রূষা হোক তোমার –

আমি বলতে চাই না আর কোনোকিছু
শুনতে চাই না কোনোকিছু
জানতে চাই না কোনো প্রগতির দুর্গতি, তথ্যের মহামারি
নক করতে চাই না কারো নিঃসঙ্গতার নগ্ন ক্যানভাস।
দেহের ভেতরে মৃত মনের সৈকতে পড়ে আছে
ঝাঁকে ঝাঁকে ফ্যাকাশে রঙা অক্টোপাস।
তবু ছুটি নাই, ছুটি নিতে হবে – যেতে হবে অসুস্থ পারাপারের অপারে।

এক জন্মান্ধ কঙ্কাল ঝরনার দিকে চেয়ে শুধু জলের প্রপাত গুনে যায়...

পাগলাগারদ

পপকর্ন ভাজার মতন পাগলের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে
গরাদ উপচিয়ে পাগল পড়ে যাচ্ছে নিচে।
গরাদের বাইরেও ইশকুল খুলছে নয়া পাগলাগারদ –

বিপন্ন মস্তিষ্ক নিয়ে ঈশ্বর ঘুমাচ্ছে স্যানাটোরিয়ামে –
তার হট ক্রেজি সেবিকারা জোনাকির ডানা মেলে
ঔষধ, ইনজেকশন আর স্পিরিটের গন্ধে মুছে দিচ্ছে
সকালের কপালে জমে ওঠা ঘাম।
পাগল আমি, পাগল তোমার ছদ্ম ডাকনাম –
পাগলের গ্যারেজের অন্ধকার কুনচিতে জন্ম নিচ্ছে
প্রেমের দত্তক নেয়া শিশু নয়নতারার গান।
ঈশ্বরের সাথে তার বাবা-মায়ের যুদ্ধে
হাতে পাওয়া নতুন কামান।

বিধ্বস্ত মস্তিষ্ক সমুদ্রে মাথা ডুবিয়ে দেখে
তার রূপে রূপসী গোল্ডফিশ।
ক্ষয়িষ্ণু সময়ের সহিষ্ণু হাড় চিবাতে চিবাতে
হ্যাং আউট করছে অসময়ের বিষ।

যার রক্তের খনি চুরি করে ব্লাডব্যাগের পাইপ
পৃথিবীর বন থেকে চলে গিয়ে মরুভূমিতে ফোটাচ্ছে চাঁদ –
তার শিশুর শূন্য চোখের তারায় নোঙর ফেলছে শান্তিচুক্তির ফাঁদ।

পাগল আমি, পাগল তোমার ছদ্ম ডাকনাম –
পাগলের গ্যারেজের অন্ধকার কুনচিতে জন্ম নিচ্ছে
প্রেমের দত্তক নেয়া শিশু নয়নতারার গান। ঈশ্বরের সাথে তার
বাবা-মায়ের যুদ্ধে হাতে পাওয়া নতুন কামান।

কখনো আমি আর ফিরে না এলে তুমি ফিরে যেয়ো
আমাদের স্বপ্নের শেষ ঘুমছুট বালুকাবেলায়।
তার তীরে রোদ কুড়াতে আসা প্রতিবিম্বকে
জানিয়ে দিয়োঃ তোমার চিরকুমারী মা
উন্মত্ত ঈশ্বরের আপাদমস্তক ব্যান্ডেজ মোড়ানো
সুস্থ্ স্বাভাবিক রায়ে চলে গেছে তারাফুলের শীতল ছায়ায়।

বৈপরীত্যের প্রিয় আহার

রাস্তার ওপর ট্রলিব্যাগে আমাকে বসিয়ে রেখে
তুমি চলে গেছ একটু পরেই ফিরে আসবে বলে –
আমি এখানে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মানুষের পা
গুনতে গুনতে ভুলে যাচ্ছি ছোটোবেলায় সংখ্যা গোনার শিক্ষা।
একটা ভবঘুরে আমার কোনো এক আগের জন্মের প্রাগৈতিহাসিক
প্রেমিকের মতো পাশে বসে আছে
তোমার ফিরে আসা, না আসার অপেক্ষায়।
আমরা দুইজন আলাদা আলাদা প্রার্থনা নিয়ে মেলার মধ্যে
হারিয়ে যাওয়া যমজ ভাইবোনের মতো খুঁজছি তোমায়।
তুমি জানো তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি
হয়ে যেতে পারি পাথরের ভাস্কর্য। তাই তোমার ফেরার তাড়াটা
পেছাতে পেছাতে সূর্যের ছায়া হয়ে গড়িয়ে পড়ে রাতের মোহনায়।
একটা ফুটবলের মতো ভাসতে ভাসতে চলে যায় স্বেচ্ছানির্বাসনের নরকে।
মানুষের মন পূর্ণতার সবুজ জঙ্গল ছেড়ে পালাতে চায়
মরুভূমির বিশুষ্ক নাড়ির টানে – আবারও পূর্ণ হয়ে ওঠার তৃষ্ণায়।
ভবঘুরেটা তার সব যাত্রা লাটাইয়ের মতো মুঠোতে গুটিয়ে
বসে আছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। আর আমি বহুদিকে ছড়ানো
যাত্রার মাস্তুলগুলো জোর করে ঘুরিয়ে রেখেছি
তোমার ফিরে আসার পথের দিকে। আমাদের চাওয়াগুলো
এভাবেই কেন বরাবর হয়ে যায় বৈপরীত্যের প্রিয় আহার?

ক্রসফায়ার, শাট শাট

ছুটন্ত তারকার মতো ছুটে যায় আমার 'না'
ক্রসফায়ারে 'ক' নিহত, 'চ' নিহত, 'হ' নিহত, 'ট', 'ত'...
'না' বলার অপরাধে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে চকের মতন মুছে যাওয়া
কাক জানবে না, পক্ষী জানবে না, শুধু কাঁদবে আমার মা
ছুটন্ত তারকার মতো ছুটে যায় আমার 'না'

ক্রুশ থেকে যিশু ঝাপটায় রক্তের আলপনা করা ডানা
যারা ফুটো করে অপরের হৃৎপিণ্ড, তাদের হৃৎপিণ্ড জন্মাবধি ফুটো করা
নথি নাই, পত্তর নাই, আইন নাই, বিচার নাই
এটা কেমন মরা?
কাক জানবে না, পক্ষী জানবে না, শুধু অন্ধ হবে আমার মা
এই দেহটাই গোসল করাত সে ছোটো বাথটাবে কুসুম কোমল জলে
পক্ষে গাইবে না কেউ, বিপক্ষেও গাইবে না
বলো, এটা কেমন মরা?
ছুটন্ত তারকার মতো ছুটে যায় আমার 'না'

বাজাও আনন্দের সুর

বাজাও আনন্দের সুর
ব্যথাগুলো যখন আর ব্যথা লাগছে না
তুমুল বিরোধিতায় আর বিরক্ত হচ্ছ না
গত বর্ষার কান্নাভেজা রুমাল
এবার শরতে শুকিয়ে হাস্যোজ্জ্বল
বাজাও আনন্দের গিটার
স্বর্গ খুব কাছেই যে তোমার
আবারও দিন এলে জাগবে সংগ্রাম
আবারও জোছনাধারায় রক্তাক্ত প্রান্তর
তার আগে এই আদিম ও প্রশান্তিময়
একা থাকা
বাজাও আনন্দের সুর
বিষণ্ন বা ব্যঙ্গ করে কিছু বাজিয়ো না।

ধারণা

প্রতিদিন যেটুকু দৌড়াই
সেটুকুই ফিরে আসি
অদ্ভুত জাদুবলে।
প্রতিদিন যা বুঝি
তার আসলে ভুল পাঠ নিই
বিজ্ঞতার ছলে।
মাকড়সার ডিমের মতো একটা কফিনে বাস করে
চোখকে আলোর গতি সম্পর্কে
ধারণা দেয়ার চেষ্টা করি।
আর মরুভূমিতে কয়েকটা ফিকে
সবুজের চিহ্ন দেখে ভাবি
কচ্ছপের মতো দীর্ঘায়ু হতে আর বাধা কই?
প্রেমের কবিতা লিখতে গিয়ে
লিখে ফেলি অক্ষরহীন আস্ত একটা দর্শনের বই।

মরণে-জাগরণে

যানবাহনের নিজস্ব কোনো আত্মা নেই বলে
আমাদের আত্মা নিয়ে চলে।
উন্মাদ, অস্থির, উত্তাপ
উত্তাপ, অস্থির, নিষ্পাপ, উন্মাদ
শরীরে শরীর শেকল বেঁধে দাঁড়াই
তবু উপচে যাই, পিছে পড়ে যাই
ভেঙে খান খান, পুড়ে পুড়ে ছাই
চিৎকার
শুধু একটু বেঁচে থাকার জন্য এতটা ধিক্কার
ঘটনা না, আমি চাই মহা দুর্ঘটনা ঘটুক।

পুলিশ মেরেছে তো কী হয়েছে!
মাথা ফেটেছে, পায়ে চোট, চোখ দু'টো গেছে?
পুলিশ আমাদের লোকাল অভিভাবক।
বিশ্ব-অভিভাবকের তুমি কামাসক্ত শাবক।

জমে জমে পুঁজ, জমে জমে রক্ত...
পুঁজি হয় জানি খাঁটি পরিপোক্ত
তুমি-আমি-সে-তারা, আরো যত দিশাহারা
সবাই পুঁজির ভক্ত
জনগণ ও রাষ্ট্র
পাছা মারা খেতে আর পাছা মারতে
দুজনেই বিশেষ দক্ষ।

ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে যে ভ্রূণ
কেউ কি তার বৃদ্ধি দেখতে পায়?
ক্ষণে ক্ষণে যে ঝড় ধেয়ে আসে
কেউ কি তার আওয়াজ শুনতে পায়?

শঙ্খ কানে নিয়ে তুমি
দেখো নিরুপম গোধূলি
দেখো তোমার আমার মৃতদেহের নিচে
একটা ঘাস খুব বেগুনি।

যে তুমি এতটা সহো, যে তুমি নগ্ন,
অন্ধকারে একটা বই হাতে জমে ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছ –
নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেকেই দিতে বলো।
বেরিয়ে আসো পথে
সবাই রূপকথার রাজা-রানী সাজছে যখন স্বপ্নে...
ফিরে আসো অঙ্কুরিত এককণা সবুজ দেখে
সিলিং-এর রশি ছিঁড়ে বাঁচার ঈর্ষা জাগা প্রাণে
এতটা সইতে পারো বলে তুমিই পারো
এতটা জোরে চিড়িয়াখানার গরাদে লাথি মারতে।

টাকা, তোমার অভাবে

ও আমার সবুজ অক্সিজেন
ও আমার বেঁচে থাকার ঝুমঝুম শব্দ
ও আমার কুয়াশা আর ঠান্ডা আশায়
ভেসে থাকা বাতিঘর
ও আমার শরীরে জড়িয়ে থাকা এক
নির্বাক জংলি শীৎকার
ও আমার ক্ষতবিক্ষত প্রেম
ও আমার পায়ের নিচে তপ্ত লোহার ব্রিজ
ও আমার নিরীশ্বর হৃদয়ের নতুন নির্বাচিত ঈশ্বর
ও আমার মহাকাশের কাশবনে উড়ে বেড়ানো
মাল্টিকালার প্রজাপতি
ও আমার অস্বস্তির ভরা গ্লাসে স্বস্তির বরফকুচি
ও আমার অন্ধকারে দক্ষিণা বাতাসে
সাপের মতো বেরিয়ে আসা ঝাঁক বাঁধা জোনাকি
ও আমার মৃত আকাশের ভাঁজে
রূপকথার হাড়ে তৈরি ধ্রুবতারা।
তুমি ছাড়া আমি মাজুল, দিশাহারা।
তোমার দেখা না পাইতে পাইতে
মরুভূমির খোলা হাওয়ায় জবাই করা উটের
নাড়িভুঁড়ির মতো শুকাতে শুকাতে
আমি আবার ফিরে যাচ্ছি শ্যাওলার আস্তরণের নিচে
মাছের ঠোকর খাওয়া অজানা কোনো প্রেমিক-প্রেমিকার
নিষিদ্ধ, কম্পিত, উগ্র জন্মজগতে।
আমার অতনু অস্তিত্বে
মন্ত্রণা দিতে আসে এক বেগুনি মৎস্যকন্যা
বলে, হাত দিয়ো না পুঁজির আগুনে।
আসে এক হলুদ মৎস্যকন্যা
বলে, পোড়াও হাত ব্যক্তিক তৃপ্তিসাধনে।

সময়ের সাথে প্রেম

যতই অবহেলা করো তুমি আমাকে
তোমার অবহেলায় পৃথিবীর সব বনে
পাতাগুলো মাথা নিচু করে ঝরে যাবে
আমার মনে জমবে অভিমানের ভারী ভারী মেঘ
সেই মেঘগুলোই বৃষ্টি নামাবে মরা জঙ্গলে
যতই তুমি অবহেলা করো, আরো বেশি করে
আমি ভালোবাসব তোমাকে।

যতই তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও
সুদূর নক্ষত্রের মতো আকাশে তাকাও
আমি তোমার আরো বেশি কাছে চলে আসব
আমি এক ভয়ানক নাছোড়বান্দা চুম্বক
ফেউয়ের মতো অনুসরণ করি তোমার পথ
যতই তুমি ইচ্ছা করে অন্ধকারে নিখোঁজ হয়ে যাও
সূর্য হয়ে আমি তল্লাশি চালিয়ে খুঁজে আনব তোমায়।

যতই তুমি ভুলে যাও আমার কথা
আমি থাকব তোমার মধ্যে সবসময় – এটাই শেষ চাওয়া।
যতই তুমি আমাদের মাঝখানে তোল যুদ্ধের দেয়াল
আমি সেই দেয়াল ভাঙতে হব ফুলের বুলডোজার
আমার দিকে ছোড়া তোমার প্রতিটা গুলি
উড়ে আসতে আসতে হয়ে যাবে পেলব পালক।
প্রতিটা কামান গর্জন করে বলবে – সরি!
যতই তুমি শোনাও আমাকে যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি
আমি বলব শুধু – ভালোবাসি।

মা ও ছানা

এই বেদনার্ত উপকূলে, সৈকতে প্রসূতি নীলতিমি –
নিঃশব্দ, যেন জন্মবধির। তার না করা আর্তনাদ
গাইছে ওই নীল সাগর বিরতিহীন গর্জনে।
আলোমুখী তারারা ছাড়া আর নাই কোনো সহমর্মী পড়শি চরাচরে।
আমাদের শিয়র মিলে গেছে যুদ্ধের নিশানায় –
তাই দেখি, ফুলপ্রেমীরা কেন যুদ্ধশিশু হয়ে যায়।
সবচাইতে শক্তিশালী মহাশূন্যযানের চাইতেও দ্রুতগতিতে
ছুটে যাচ্ছে ট্রেন – আসলে ছুটছে তোমার আমার দুঃসময়
দুলে দুলে একটা আদুরে প্লাস্টিকের সাপের মতো
শেষ না হওয়া মরুভূমিটাকে শেষ করে ফেলবে পাড়ি দিয়ে।
তাই সূর্য উঠলে আমরাও উঠে পড়ি –
গাছকে বলি, পানি খাও।
কিছু বিস্কিট গুঁড়ো করে রাখি বারান্দায়, যাতে
না পোষা পাখিগুলো খেতে পায়।

শরবিদ্ধ হরিণকে ছেড়ে যায় আতঙ্কিত হরিণের পাল
কিন্তু ছেড়ে যায় না বন – কারণ বনেরও ডালগুলো ভাঙা
ঝড়ের সাথে ক্রমাগত সংঘর্ষে।
আমাদের শিয়র মিলে গেছে সেই পথে
যে পথে লুটতরাজ, হৃদয় হত্যার অপরাধ।
তোমার গোপন সিন্দুক রাখো আরো গোপন করে
কোনোকিছু যেন চুরি না যায়। যেই হীরক জমিয়ে রাখো অন্ধকারে
একদিন তাতে শ্যাওলা ধরুক আশা করে,
সেই হীরা চড়ামূল্যের বাজারে বিনামূল্যে
বিক্রি করে ফেরে তোমার সন্তান ক্লান্ত শরীরে।
পৃথিবীর সাথে পাঞ্জা লড়ে লড়ে আজ সে এমন কাহিল –
কেননা, সব সঙ্গ নিঃসঙ্গতায় ফিরে পায় অন্ত্যমিল।

তুমি অ্যাবসেন্ট, তুমি মুক্ত

এই মুহূর্তে তোমার দুই চোখে অন্ধকারের
সর্ষেফুল কুড়িয়ে কোথাও আকাশের কিনারে
জ্বলছে গান গাওয়া তারা।
উটকো ভবঘুরে শিশুর মতন ওই সমুদ্রকে ছুঁতে
প্রদীপ ভাসায় জন্মান্ধ জেলের কঙ্কাল...

এই মুহূর্তে তুমি খুন হচ্ছ
তোমারই বিষের বাগানে ফোটা ফুলের সুগন্ধে।

প্রতারক বলে সকালের রোদে
যার দিকে পিঠ তুলে দাঁড়িয়েছ
সে নিজেই ঝুলে আছে অন্য কারো
প্রতারণার গোলাপি ফাঁসের দড়িতে।
অভিমান জেনে গেছে তাকে কেউ ডাকবে না আর
মিষ্টি কোনো ডাকনামে।

এখানে তুমি আছ স্থান-কাল-পাত্র-অপাত্র মনে রেখে।
তোমার মন ভয়ে গাংচিল হয়ে
তোমায় রেখে অন্য কোথাও পালিয়েছে।

দাসের দ্যাশে তোমার চাকরি প্রতিনিয়ত...

লাল কাঁকড়ারা পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বলে,
'তুমি অ্যাবসেন্ট, তুমি মুক্ত!!!'

ব্যক্তিগত ঈশ্বর

তোমার, আমার, আপনার – এমনকি একটা ছোট্ট গুগলি শামুকের মধ্যেও
যদি ঈশ্বর থাকে, মানে প্রাণে প্রাণ মিলে যায় যে ইচ্ছায়
তাকে যদি ঈশ্বর বলি, তাহলে আমরা সবাই একেকটা ঈশ্বর
কিংবা যে যার ব্যক্তিগত ধারালো আয়নার মুগ্ধ দর্শক।
তাহলে ফিলিস্তিনে, আফ্রিকায়, ইউক্রেন, সিরিয়া কিংবা আফগানিস্তানে
ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো, নিরীহ প্রজাপতির মতো যারা মরে যাচ্ছে
তারাও তো যে যার গরাদের আকাশে ব্যক্তিগত ঈশ্বর।
এই ব্যক্তিগত ঈশ্বরগুলো অন্য কিছু ব্যক্তিগত ঈশ্বরের
বোমায় আয়নায় রেখে যায় শেষ রক্তের টিপসই। গৃহযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ বা শুধুই
আগ্রাসনের জন্য
যে যুদ্ধগুলো ঘটে, সেগুলো কি তবে ঈশ্বরে ঈশ্বরে সাদাকালো ছকে
দাবার চাল? যার মূক বোড়ে হয়ে তুষারপাতের মতন
মানুষের প্রাণ ঝরে ঝরে গলে সময়ের নির্লিপ্ত রোদে শুকিয়ে যায়।

ফানি লাভ স্টোরি

নরকের মধ্যের একটা কেবিনে
ডারউইন আর রোমিও বিবর্তন নিয়ে তর্ক করছে।
ডারউইনের মতে বিবর্তনে সবকিছুরই উন্নতি হয়
আর রোমিওর মতে বিবর্তন যেকোনো কিছুকে
ধ্বংস করে দেয়। তর্ক করতে করতে তারা
কোনো সমাধানে যেতে না পেরে
চুরুট ধরিয়ে ঈশ্বরকে ডাকল।
তার সামনে আবার গোড়া থেকে
তর্কের লৌহজাল বুনতে শুরু করল।

আমেরিকান আন্ডারগ্রাউন্ড অস্ত্রাগারে
ফ্যাকাশে চামড়ার একজন অস্ত্রবিজ্ঞানী
ম্যাপের টার্গেটের ওপর বুনছে আক্রমণের জাল।
তার মতে যাদের ওপর আক্রমণ
চালানো হবে, তারা বহুকাল ধরেই মৃত।
শুধু তাদের মৃত্যুকে সার্টিফাই করতেই
এ বন্য আক্রমণের অগ্নিকাণ্ড।
বোমার হুলুস্থুল ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ছে
ম্যাপের ওপর আর ম্যাপটা তাকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে
ভূমধ্যসাগরের শীতল হাওয়ায়।

অনেক বছর ঘুমিয়ে থাকা একটা আগ্নেয়গিরির গুহায়
মোম জ্বেলে তুমি কথা বলছ ছায়ার সাথে।
তোমার বলা কথা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে
তোমার কাছে। আগ্নেয়গিরিটা জ্বলে ওঠার আগেই
তার মাথায় নেমেছিল কালো বৃষ্টি।
ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি থেকে জন্ম নিচ্ছিল
প্রতিধ্বনি। ফোঁটা ফোঁটা নিঃসঙ্গতার হাড়ে
জমে উঠছিল প্রেমের মধু।

সি-বিচের পাশে বসে শীতের মধ্যে
কোল্ড কফি খাচ্ছিল একটা লোক।
আকাশে চিলের মাঝে উড়ছিল বহুজাতিক বেলুন।
লোকটার কফির মগ বারবার ভরে উঠছিল
আবার খালি হয়ে যাওয়ার তৃষ্ণায়।
বিচের কিনারায় কয়েকটা ঝিনুককুড়ানি শিশু
হাতে হাতে বদল করছিল আগুনের ভলিবল।

হঠাৎ আমেরিকান অস্ত্রবিজ্ঞানীর ঘুমঘুম হাত থেকে
একটা ড্রোন বোমা টার্গেটবিহীনভাবে ছুটে এসে
টার্গেট করল তোমাকেই।
তোমার সমস্ত জড়তা, আগ্রহ, সিরিয়াসনেস, বিরক্তি,
আসক্তি নিয়ে তোমার রক্ত আগ্নেয়গিরির লাভা হয়ে
বেরোতে লাগল গুহা দিয়ে।
তাই দেখে ঠান্ডায় কোল্ড কফি খাওয়া লোকটা
উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল 'ক্রাশ, ক্রাশ...!'

এই চিৎকার শুনে ডারউইন তার সাদা দাড়িতে
আঙুল চালাতে চালাতে চুপ মেরে গেল।
রোমিও তার সোনালি চুলে ব্যাকব্রাশ করতে করতে
সিটটাকে ঢালু করে শুয়ে পড়ল।
ঈশ্বর বিড়বিড় করে বলল: প্রেমের বিবর্তন হলে ক্রাশ হয়।

আগামীকাল

কিছু একটা ঘটবে এই অপেক্ষাতে আছি।
যে রক্তবিন্দু চামড়ায় ঢেকে বসে আছি,
তা হয়তো বেরিয়ে আসবে সবুজ চামড়ার পোশাক ছিঁড়ে।
নিশ্বাসের আয়নায় জমে ওঠা কুয়াশায়
মুখোশের সাথে সংঘর্ষ হবে মুখের।
কানামাছি দিয়ে ফাঁকি দুপুর রোদে গাইবে
রাতের মতো অতল মৃত্যুসঙ্গীত।
ধূসর রাস্তা রং বদলাবে লাল ফোয়ারার সাথে।
সেই ফোয়ারা বইতে বইতে গিয়ে শেষ হবে
এক জন্মান্ধ জ্যোতিষীর পঙ্গু টিয়ার লাল ঠোঁটে।
যে ঠোঁটে সে প্রেসিডেন্টের জন্য
তুলছে রাষ্ট্রের অক্ষরবিহীন ভাগ্যলিপি।

ছায়ারা জড়ো হয় বৃক্ষের গানে

ফুটবলের মতো কিক মারতে মারতে আমাকে পাঠিয়ে দাও
সীমানার বাইরে। মাঠে মাঠে পা থেকে পায়ে ঘোরার
খায়েশ আমার আর নাই। এক প্রকাণ্ড কিকে
পাঠিয়ে দাও সীমানার বাইরে, যেখানে একটা বালক
তার পুরোনো খাতার পৃষ্ঠা গোল করে মার্কার দিয়ে
আঁকছে ষষ্ঠভুজ। তার পোষা বিড়াল
আমাকে নিয়ে খেলতে যাবে তারাদের ময়দানে –
যেখানে ভালোবাসারা ভালোবাসতে জানে,
ছায়ারা জড়ো হয় বৃক্ষের গানে।

এখানে জীবন নাই, এখানে বিস্ময় নাই

হাপরের আগুনে বাতাস করার মতো কে যেন কুয়াশায় বাতাস করে করে
আনল ভোর। আরেকটা দিনের শৈশব ব্যাটম্যানের মতন
আকাশ থেকে লাফ দিয়ে নামল জানালার সামনে।
হাই ব্যাটম্যান! হোয়াটস আপ? নাথিং! নাথিং!!
রাস্তা ঝাড়ু দেয়া বুড়িটাকে এখন আলাদা করে পানি ছেটাতে হয় না।
শিশির লেগে আছে ঝাড়ুর ডগায়, যেন একটা উড়ে যাওয়া মেঘে ভেজা
ধূমকেতুকে খপ করে ধরে সে রাস্তা ঝাড়ুর কাজে লাগাচ্ছে।
জমা হওয়া ময়লার ভেতর থেকে মুখ বের করে হাসছে শিউলিফুল।
এখানে জীবন নাই, এখানে বিস্ময় নাই।
একটা মাত্র বই বুকশেলফে, তার নাম সংবিধান।
তা-ও পড়তে পড়তে অনেক আগেই মুখস্থ।

চারপাশের সবাই স্ট্যাচু হয়ে আছে। রিকশার ওপর মুখোশে চোখ ঢেকে
ঘুমাতে ঘুমাতে স্ট্যাচু হয়ে গেছে রিকশাওয়ালা। কাওরান বাজারে
ঝুড়ির মধ্যে যে ছন্নছাড়ারা থাকে, তারা সব এখন স্ট্যাচু।
ব্রোকার হাউজের গিজগিজ ভিড়ে কোনো ব্যস্ততা নাই।
যে যেভাবে ছিল, সেইভাবেই মর্মর মূর্তি হয়ে গেছে।
ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করতে এসে নিজেই ফিক্সড হয়ে গেছেন
এক ভদ্রলোক। পার্লারে অর্ধনগ্ন মেয়েরা মুখে মাস্ক নিয়ে
ধ্যান করার ভঙ্গিতে নিশ্চল হয়ে আছে।
বিউটিশিয়ানের উদ্বিগ্ন হাত বাড়ানো তাদের দিকে।
রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলে স্ট্যাচু হয়ে গেছে
তার ছাউনির পিলারের মতো। পার্কের বেঞ্চে খুনসুটি করা পতিতা
আর তার প্রেমিক অন্তহীন প্রেমে গেঁথে আছে স্ট্যাচু হয়ে।
বেলুন ওড়াতে ওড়াতে পিঠে স্কুলব্যাগ নিয়ে তারাদের মতো ঝিকমিক
ক্রিস্টালের স্ট্যাচু হয়ে গেছে শিশুরা। চিৎকার করে
সংসদে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুখ হাঁ অবস্থায়
স্ট্যাচু হয়ে আছে রাজনীতিবিদ।

এখানে জীবন নাই। এখানে বিস্ময় নাই। এখানে কিচ্ছু নাই!
নিঃসঙ্গতায় আর কসাইয়ের স্বার্থপরতায় ঝরা উল্কার মতো জমে জমে
স্ট্যাচু হওয়ার আগেই চলো পালাই...

চলো যাই ফ্যান্টাসি কিংডম। কিংডমে নাই ফ্যান্টাসি।
আছে পেরেকের মতো মাথামোটা কিছু মাছি।
কিছু পর্যটক, যারা সিনেমার সত্যকে ভাবে
প্রকৃত সত্য। টিশার্টে ছবি দেখে লালনকে চেনে।
বিশ্বকাপের সময় ব্রাজিলের কয়েকটা ল্যান্ডস্কেপ আর
ভাস্কর্য দেখে ব্রাজিলকে বুঝে ফেলে। এখানে জীবন নাই,
এখানে বিস্ময় নাই। চলো যাই অন্য কোথাও, অন্য কোনো ঠাঁই...

এবার চিড়িয়াখানায়। কিন্তু চিড়িয়াখানা তো অন্য কিছু না,
আমাদেরই বন্দিদশার আয়না।
বাঘগুলো হ্যাংলা আর পাখিগুলো আমাদের মতনই উড়তে চায়।
নাহ, এখানেও না। চলো অন্য কোনো জায়গায়, অন্য অজানায়...

বাংলা সিনেমা দেখলে কেমন হয়? বাংলা সিনেমা
রক্তমাংসের স্তূপে মোড়ানো নিষ্প্রাণ পুতুলের কান্নাঘর।
যারা সম্মোহিত হয়ে আছে সেই ড্রাকুলার, যে ড্রাকুলা
লাল কার্পেটে করে তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যায় আলিফ লায়লার
গল্প শোনা হাজার রাত্রিতে। এই পুতুলগুলা মোটেই জাগতিক না,
এরা উঠে এসেছে মাটি ফুঁড়ে কংক্রিটের শহরে।

একবার চলো সংসদ ভবন যাই। এ কী! কেউ তো নাই।
রাশি রাশি লাশ পড়ে আছে করিডোরে। স্পিকার হলো মাইক্রোফোন হাতে
এক হলুদ কঙ্কাল। সরকার দলের কঙ্কালগুলো চিৎকার করছে
আর বিরোধী দলের কঙ্কালগুলো কানে তুলা গুঁজে বসে আছে।
কয়েকটা অন্ধ শিশু সংসদ ভবনের সামনের মাঠে
সূর্যমুখী ফুলের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

কোথাও জীবন নাই। কোথাও বিস্ময় নাই। জীবন আমাদের
শিরায় রক্তপ্রবাহের মতো লুকিয়ে আছে। বিস্ময় আছে
অসভ্য নগ্নতায় মিশে। চলো সমুদ্রে যাই। চলো নিজেদের দেখি,
যেভাবে কখনো দেখা হয় নাই। বন্য গাছের মতো আলিঙ্গনে হব নীলাকাশ।
তোমার চুমুতে পুড়ুক আমার নিশ্বাস। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন
শঙ্খের মতো কান পেতে শুনি। আমাদের স্পর্শে বালু হলো বেগুনি।
বিশাল একটা ঢেউ ঢেকে ফেলল আমাদেরকে ফেনার কম্বল হয়ে।
ঢেউ ভেঙে উঠে দেখি সেই একই পৃথিবী, ডানা মেলে আছে
শিশুদের রক্তে রঙিন আকাশে। একা ভালো থাকা যায় না,
যদি মন খারাপের হারমোনিকা বেজে চলে চারপাশে।

তাহলে কই যাই? কোথায় গেলে জীবন আছে
পাহাড়ি নাচের উত্তাল মাদকে? কোথায় বিস্ময় আছে
পাতার আড়ালে কোনো শিশুর চোখে হরিয়াল পাখির পালকের
জীবন্ত মুগ্ধতা নিয়ে? কোথাও জীবন নাই। কোথাও বিস্ময় নাই।
হয়তো জীবন আছে ইলেকট্রিসিটিহীন কোনো অজপাড়াগাঁয়ে।
হয়তো বিস্ময় লুকিয়ে আছে কোনো উলঙ্গ শিশুর হাতে
দুই টাকা দামের কমলা রঙা গলে পড়া আইসক্রিমে।